বিশ্বনবি মুহাম্মাদ

صلى الله عليه وسلم

মূল

শায়খ সালেহ আহমাদ শামী

অনুবাদ

সালমান আজিজ

সন্দীপন
প্রকাশন লিমিটেড

সূচিপত্র

লেখক পরিচিতি ১৮

অনুবাদকের কথা ২০

তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকা ২২

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা ২৩

যে যুগে রাসূল এলেন ২৮

জন্ম থেকে নুবুওয়াতলাভ ৩৪
- পবিত্র বংশ ৩৪
- জন্ম ৩৫
- দাদার জিম্মায় ৩৫
- দুধপান ৩৫
- মা ও দাদার ইন্তিকাল ৩৬
- আবূ তালিবের দায়িত্বগ্রহণ ৩৬
- ছাগল চরানো ৩৭
- অভিনব কিছু বৈশিষ্ট্য ৩৭
- খাদীজা ﵂-এর সঙ্গে বিবাহ ৩৮
- পিতার চেয়েও মহানুভব ৩৯
- কাবা নির্মাণ ৪১
- হেরাগুহায় ইবাদতনিমগ্নতা ৪২

নুবুওয়াতলাভ ৪৫
- ওহির সূচনা ৪৫
- ফাতরাতুল ওহি বা ওহি আগমনে বিরতি ৪৭
  ফাতরাতুল ওহির তাৎপর্য ৪৮
- আমি পড়তে পারি না ৪৯

গোপনে দাওয়াত ও প্রথম মুসলিমগণ ৫১
- গোপনে দাওয়াতের সূচনা ৫১

- অগ্রগামী মুসলিমগণ ৫৩
- একটি গুরুতর ভুল ৫৫
- এই সময়ের নামাজপদ্ধতি ৬১

প্রকাশ্যে দাওয়াত ও নির্যাতনের সূচনা ৬৩
- প্রকাশ্য আহ্বান ৬৩
- আবু তালিবের ঘরে ৬৫
- মূল কাজ ৬৭
- প্রত্যাখ্যান ও বিদ্রূপ ৬৮
- নির্যাতন ও পরীক্ষা ৭০
- ইয়াসির পরিবার ৭২
- বিলাল ﵁ ৭৩
- খাব্বাব ﵁ ৭৩
- অন্যান্য সাহাবি ৭৪
- ক্রীতদাসদের রক্ষায় আবু বকর ﵁ ৭৪

হাবশায় প্রথম হিজরত ৭৬

প্রকাশ্যে দ্বীনপ্রচারে সাহাবিদের ভূমিকা ৮০
- প্রকাশ্যে কুরআন তিলাওয়াত ৮০
- কুরআনের মুখোমুখি কুরাইশ ৮২
- আল্লাহর পথে আহ্বানকারী প্রথম বক্তা ৮৪
- কুরাইশের আজব সংলাপ ৮৭

হামযা ও উমারের ইসলামগ্রহণে ৯০

কুরাইশের প্রতিক্রিয়া ৯০
- হামযার ইসলামগ্রহণ ৯০
- উমার ইবনুল খাত্তাবের ইসলাম-গ্রহণ ৯২
- কুরাইশের প্রলোভন ৯৭
- ইহুদিদের সাহায্য কামনা ১০০

হাবশায় দ্বিতীয় হিজরত ১০৩
- দ্বিতীয় হিজরতের অনুমতি ১০৩
- নাজাশির দরবারে কুরাইশের দূত ১০৩
- শিক্ষা ১০৫
- কিছু মুহাজিরের মক্কায় প্রত্যাবর্তন ১০৭

দাওয়াতের মোকাবিলায় প্রোপাগান্ডা ১০৯

গিরিপথে অবরোধ ১১২
- জুলুমের চুক্তিপত্র ও তার প্রতিক্রিয়া ১১২
- কুরাইশের ভূমিকা ১১৪
- চুক্তিপত্র রচনা ও ভঙ্গ হওয়ার মধ্যবর্তী সময় ১১৫
- চুক্তিপত্র প্রত্যাহার ১১৮
- গিরিপথ থেকে বহির্গমন ১২০
  - ১. প্রচারণা ১২০
  - ২. ঠাট্টা ও উপহাস ১২১

দুঃখের বছর ১২৩
- আবু তালিবের অসুস্থতা ১২৩
- আবু তালিব ও খাদীজা ﵂ —র ইন্তিকাল ১২৫
- আবু তালিবের মর্যাদা ১২৫
- খাদীজা ﵂-র মর্যাদা ১২৬
- রাসূল ﷺ-এর বিষয়ে মুশরিকদের ধৃষ্টতা ১২৭

তায়িফ গমন ১২৯

ঈমানের শ্রেষ্ঠত্ব ১৩৩

ইসরা ও মিরাজ ১৩৭
- মুজিযা ১৩৭
- ইসরা ও মিরাজ ১৪০
- বক্ষ বিদীর্ণকরণ ১৪১
- ইসরা ১৪১
- মিরাজ ১৪২
- প্রত্যাবর্তন ১৪৩
- কুরাইশের মতামত ১৪৩
- ইসরা ও মিরাজ সম্পর্কে বিভিন্ন মতামত ১৪৪
- পর্যালোচনা ১৪৫
- শেষ কথা ১৪৭
- তাঁকে আমার নিদর্শনসমূহ দেখানোর জন্য ১৪৮
- শ্রোতার স্তর বুঝে কথা ১৫০
- নামাজ ১৫১
- অনন্য বীরত্ব ও অবিচল ঈমান ১৫৩
  - ১. আবু বকর ﵁-এর আচরণ ১৫৩
  - ২. রাসূল ﷺ-এর এই আচরণে রিসালাতের মর্যাদার বহিঃপ্রকাশ ১৫৩

- পরীক্ষা ও যাচাই-বাছাই ১৫৪

মাক্কি যুগের কুরআন ১৫৬

মদীনায় হিজরতের ভূমিকা ১৬১
- বিভিন্ন কওমের কাছে রাসূলের প্রস্তাব ১৬১
- ইয়াসরিবের কাফেলা ১৬৩
- আকাবার প্রথম বাইআত ১৬৪
- ইয়াসরিবে মুসআব ১৬৬
- আকাবার দ্বিতীয় বাইআত ১৬৯

বাইআতের কিছু ফলাফল ১৭৩

বাইআত সম্পর্কে দুটি কথা ১৭৫

রাসূল ﷺ- এর হিজরত ১৭৮
- কুরাইশের ব্যর্থ ষড়যন্ত্র ১৭৮
- সাওর গুহায় ১৮১
- ইয়াসরিবের পথে ১৮২
- মদীনায় প্রত্যাবর্তন ১৮৪
- কিছু শিক্ষা ১৮৫

১. সর্বশেষ মুহাজির ১৮৫

২. আমানত আদায় ১৮৬

৩. উপকরণ ও তাওয়াক্কুল ১৮৭

৪. মক্কার ভালোবাসা ১৮৮

৫. উট ক্রয় ১৮৯

৬. কিসরার অলংকার ১৯১

৭. হিজরি বর্ষের প্রবর্তন ১৯১

৮. মদীনায় প্রথম ভাষণ ১৯২

মদীনার জীবন শুরু ১৯৫
- ইয়াসরিব থেকে মদীনা ১৯৫

১. আউস ও খাযরাজ ১৯৫

২. ইহুদির তিন কবিলা ১৯৬
- মক্কা-মদীনায় তফাত ১৯৭
- ভিত্তি স্থাপন ১৯৮

১. মসজিদে নববি নির্মাণ ১৯৮

২. ভ্রাতৃত্ব ২০০

৩. সামাজিক ও রাজনৈতিক পুনর্বিন্যাস ২০৩

৪. ভালোবাসা সৃষ্টির দুআ ২০৬
৫. বাধাবিপত্তি অতিক্রম ২০৭

আয়িশা ﵂- এর সাথে বিয়ে ২০৯

জিহাদ প্রবর্তন ২১৫
- যুদ্ধের অনুমতি ২১৫
- ধৈর্য ধরার নির্দেশ : অন্তর্নিহিত রহস্য ২১৬
  মক্কায় যুদ্ধ নিষিদ্ধ ছিল কেন? ২১৭
- অনুমতি থেকে বাধ্যবাধকতা ২১৮
- আত্মরক্ষা ও আক্রমণ ২১৮
- ইসলাম ও জিহাদের শত্রুরা ২২০

গাযওয়া ও সারিয়্যাসমূহ ২২২

শরীয়ত : হিজরতের পরে, বদরযুদ্ধের আগে ২২৭
- ১. নামাজ ২২৭
- ২. আযান ২২৭
- ৩. কিবলা পরিবর্তন ২২৯
  কিবলা পরিবর্তনে মুসলিমদের আচরণ ২৩২
- ৪. রমজানের রোজা ২৩৩

বদর যুদ্ধ ২৩৪
- দ্রুত মদীনাত্যাগ ২৩৫
- পট পরিবর্তন ২৩৬
- পরামর্শ ২৩৭
- বদর প্রান্তরে ২৩৯
- কুরাইশের সৈন্যদল ২৪২
- যুদ্ধের আগের রাত ২৪৫
- যুদ্ধ ২৪৬
- যুদ্ধের পরে ২৪৮
- জমিনের বোঝা ও রাসূলের ধৈর্য ২৪৯
- মদীনায় প্রত্যাবর্তন ২৫১
- বন্দি ও গনিমত বণ্টন ২৫২
- মুক্তিপণ ২৫৩
- বদরের শহীদগণ ২৫৫
- "আল্লাহ তাআলাই নিক্ষেপকারী" ২৫৫

- ইয়াওমুল ফুরকান বা মীমাংসার দিন ২৫৯
- অনুপস্থিত থেকেও যারা অংশীদার হলেন ২৬২
- কুরাইশের পরাজয় ২৬৩
- ঈমানের শিক্ষা ২৬৫
- বদর-পরবর্তী মদীনার হালচাল ২৬৭

বদর থেকে উহুদ ২৭১
- গাযওয়া ও সারিয়্যাসমূহ ২৭১
  - বানু সুলাইম অভিযান ২৭১
  - গাজওয়াতুস সাবিক ২৭১
  - গাযওয়াতু যি আমর ২৭২
  - গাযওয়াতু বাহরান ২৭২
  - গাযওয়া বানু কাইনুকা ২৭২
  - সারিয়্যাতু যাইদ ইবনুল হারিসা ২৭৪

ফাতিমা ﵂- এর বিয়ে ২৭৬
- ইহুদিদের নানান ফিতনা ২৮০

উহুদ যুদ্ধ ২৮২
- একাধিক বিদ্বেষের মিশ্রণ ২৮২
- মদীনায় ২৮৩
- রণাঙ্গনে ২৮৪
- যুদ্ধ ২৮৬
- তিরন্দাজদের অবাধ্যতা যুদ্ধের ফলাফল যেভাবে বদলে দেয় ২৮৭
- যুদ্ধের শেষাংশ ২৯০
- হামরাউল আসাদ ২৯৩
- উহুদ যুদ্ধের লাভক্ষতি ২৯৪
- বিপদ থেকে শিক্ষা ২৯৫
- আসুন চিন্তা করি ২৯৭
  - ১. পরামর্শ ও সিদ্ধান্ত ২৯৭
  - ২. যুদ্ধ ও সৈন্যসংখ্যা ২৯৮
  - ৩. যুদ্ধের মানসিক দিক ২৯৮
  - ৪. কিছু ঈমানি ভূমিকা ২৯৯
  - ৫. 'উহুদ পাহাড় আমাদেরকে ভালোবাসে, আমরাও তাকে ভালোবাসি।' ৩০১
  - ৬. মুশরিকদের সেনাদলে দাসদের অংশগ্রহণ ৩০১

- উহুদ যুদ্ধের পর মদীনার পরিস্থিতি ৩০৩
  - ১. নিফাকের প্রকাশ ৩০৩
  - ২. ইহুদি ৩০৬
  - ৩. মিডিয়ার যুদ্ধ ৩০৬

উহুদ যুদ্ধের পরে ৩১০
- মদীনা দখলের লোভ ৩১০
- রাজীর ঘটনা ৩১২
  - শিক্ষা ৩১৪
- বীরে মাঊনা ৩১৬
  - বানু নাযীরের নির্বাসন ৩১৮
- বদরের শেষ গাযওয়া ৩২১
- দুমাতুল জান্দালের গাযওয়া ৩২২

খন্দক যুদ্ধ ৩২৪
- যুদ্ধের কারণ ৩২৪
- পরিখা খনন ৩২৫
- মদীনার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ৩২৯
- বানু কুরাইযার দুর্গ ৩২৯
- মুসলিম শিবির ৩৩০
- মদীনার প্রবেশপথে কাফিরজোট ৩৩১
- বানু কুরাইযার কেল্লায় হুওয়াই ৩৩২
- বানু কুরাইযার চুক্তিভঙ্গের ঘোষণা ৩৩৩
- মুসলিমগণ গভীর সংকটে ৩৩৪
- সংলাপ ৩৩৬
- ঝোপ বুঝে কোপ ৩৩৭
- ইয়াওমুল আহযাব বা সম্মিলিত শক্তির দিন ৩৩৯
- আহযাবের রাত ৩৪০
- একাই পরাজিত করলেন সম্মিলিত কাফিরজোট ৩৪২
- মদীনায় প্রত্যাবর্তন ৩৪২
- খন্দক যুদ্ধের শিক্ষা ৩৪৩
  - ১. নেতৃত্বের ভূমিকা ৩৪৪
  - ২. যুদ্ধের মানসিক দিক ৩৪৬
  - ৩. শক্তি-সামর্থ্যের উত্তম ব্যবহার ৩৪৭
  - ৪. অর্থনৈতিক প্রভাব ৩৪৭
  - ৫. কল্পনা ও বাস্তবতার মাঝামাঝি ৩৪৯

৬. হুযাইফার গুরুদায়িত্ব ৩৫১
৭. হালাল-হারাম ৩৫২
৮. আহতদের সেবায় ৩৫৩

গাযওয়ায়ে বানু কুরাইযা ৩৫৫
- জিবরীলের নির্দেশ ৩৫৫
- অবরোধ ৩৫৬
- রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ফায়সালা মেনে নেমে আসা ৩৫৭
- সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন ৩৫৮
- প্রত্যাশিত শাস্তি ৩৫৮

খন্দক ও কুরাইযা যুদ্ধের পরে ৩৬০
- সাদের ইন্তিকাল ৩৬০
- সাল্লাম ইবনু আবিল হুকাইকের হত্যা ৩৬১
- মুহাইয়িসা ও হুয়াইসার ঘটনা ৩৬১
- গাযওয়ায়ে কুরাইযার প্রসঙ্গকথা ৩৬২
- মদীনা : খন্দক ও কুরাইযা যুদ্ধের পরে ৩৬৩

যাইনাব رضي الله عنها- এর বিয়ে ও পর্দার বিধান ৩৬৬
- যাইদের সাথে যাইনাবের বিয়ে ৩৬৬
- আয়াতের তাফসীর ৩৬৭
- ভিত্তিহীন বর্ণনাসমূহ ৩৬৯
- পর্দা ৩৭২
- যাইনাব رضي الله عنها-এর বিয়ে নিয়ে কিছু ভাবনা ৩৭৩

একটি গাযওয়া ও সারিয়্যা ৩৭৭
- গাযওয়ায়ে বানু লিহইয়ান ৩৭৭
- ঈসে যাইদ ইবনু হারিসার সারিয়্যা ৩৭৮

গাযওয়ায়ে বানুল মুসতালিক বা গাযওয়ায়ে মুরাইসি ৩৮০
- যুদ্ধের বিবরণ ৩৮০
- ছাড়ো, এই আহ্বান পূতিগন্ধময় ৩৮০
- অপবাদের ঘটনা ৩৮২
- বানু মুসতালিক যুদ্ধ : কিছু ভাবনা ৩৮৫
  ১. যুদ্ধের প্রেক্ষাপট ৩৮৫
  ২. মুনাফিকগণ ৩৮৬
  ৩. রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রজ্ঞা ৩৮৮
  ৪. মধ্যপন্থা ৩৮৯

সারিয়্যা সীফুল বাহর ৩৯০

ইহুদিদের তৎপরতা পর্যবেক্ষণ ৩৯৪

হুদাইবিয়ার সন্ধি ৩৯৬
- মক্কার পথে ৩৯৬
- সংলাপ ৩৯৭
- বাইয়াতুর রিদওয়ান ৪০০
- চুক্তি সম্পাদন ও শর্তাবলি ৪০১
- আবূ জান্দাল ৪০২
- উমারের অবস্থান ৪০৩
- ইহরাম ভঙ্গ ৪০৪
- বানু খুজাআ ও বানু বাকর ৪০৪
- মদীনায় প্রত্যাবর্তন ৪০৫
- মদীনায় আবূ বাসীর ৪০৫

  আবূ বাসীরের দল ৪০৬
- হুদাইবিয়ার সন্ধি ও কিছু ভাবনা ৪০৭

  ১. কুরাইশের সাথে সন্ধি ৪০৭

  ২. নিজেদের চিন্তাকে শুদ্ধ মনে কোরো না ৪০৮

  ৩. পৃথিবীর বুকে শ্রেষ্ঠ মানুষ ৪১০

  ৪. বিজয় ৪১২

  ৫. তৎপরতামূলক জ্ঞান ৪১২

গাযওয়ায়ে যি কারাদ (গাবাহ) ৪১৪

খাইবার যুদ্ধ ৪১৭
- ইহুদিদের অব্যাহত ষড়যন্ত্র ৪১৭
- খাইবারের পথে ও বিজয় ৪১৮
- আলি ﷺ-এর কামুস দুর্গ জয় ৪১৯
- খাইবারে ইহুদিদের থাকার সুযোগ ৪১৯
- বিষাক্ত ছাগল ৪২০
- ফাদাক ৪২০
- মদীনায় প্রত্যাবর্তন ৪২০
- খাইবার যুদ্ধ ও কিছু ভাবনা ৪২১

  ১. পতাকা পাবে কে? ৪২১

  ২. খাইবারে ইহুদিদেরকে থাকতে দেওয়া ও অন্যান্য ৪২২

  ৩. পক্ষ-বিপক্ষে আবেগ-অনুভূতি ৪২২

৪. খাইবার-পরবর্তী অর্থনৈতিক অবস্থা ৪২৪
▪ হাবশা থেকে জাফর ইবনু আবূ তালিবের প্রত্যাবর্তন ৪২৫
▪ বাশীর ইবনু সাদ আনসারির সারিয়্যা ৪২৭

যাতুর রিকা যুদ্ধ ৪২৯

রাজা- বাদশাহদের কাছে দূতপ্রেরণ ৪৩২
▪ উপযুক্ত সময় ৪৩২
▪ হিরাক্লিয়াসের কাছে ৪৩৩
▪ কিসরার কাছে ৪৩৫
▪ অন্যান্য পত্র ৪৩৫
▪ ফলাফল ৪৩৫
▪ একটি অনুসন্ধানমূলক সারিয়্যা ৪৩৬
▪ কাযা উমরা ৪৩৯
▪ আমর ইবনুল আস, খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ ও উসমান ইবনু তালহার ইসলামগ্রহণ ৪৪০

মূতা যুদ্ধ ৪৪৬
▪ যুদ্ধের কারণ ও ঘটনাবলি ৪৪৬
▪ তিন আমীরের মৃত্যুসংবাদ ৪৪৮
▪ গাযওয়ায়ে মূতার ভাবনা ৪৪৯
১. রোমের সঙ্গে প্রথম লড়াই ৪৪৯
২. রোমের সেনাবাহিনী ৪৪৯
৩. নতুন মানদণ্ড ৪৫০
৪. আল্লাহর তরবারি ৪৫১
৫. সম্পূরক প্রাজ্ঞতা ৪৫১
৬. নেতার সম্মানের নববি শিক্ষা ৪৫২
▪ সারিয়া যাতুস সালাসিল ৪৫৪
▪ যাতুস সালাসিল : কিছু ভাবনা ৪৫৫
১. ইসলামের শত্রুরা ৪৫৫
২. আমর ও আবূ উবাইদা ৪৫৬
৩. আমরের প্রজ্ঞা ৪৫৬
৪. আমরের মর্যাদা : ৪৫৭

মক্কা বিজয় ৪৫৯
▪ কুরাইশের চুক্তিভঙ্গ ৪৫৯
▪ মদীনায় আবূ সুফইয়ান ৪৬০

- মক্কা অভিযানের প্রস্তুতি ৪৬১
- কুরাইশের প্রতি হাতিবের চিঠি ৪৬২
- মক্কার পথে ৪৬৩
- মাররুয যাহরানে যাত্রাবিরতি ৪৬৪
- দায়িত্ব বণ্টন ৪৬৭
- আবূ সুফইয়ান মক্কায় ৪৬৮
- মক্কায় প্রবেশ ৪৬৯
- সাধারণ নিরাপত্তা ৪৭১
- মুক্ত ৪৭১
- মূর্তির ঘর ধ্বংস ৪৭২
- মক্কা বিজয়ের ভাবনা ৪৭৩
  - ১. আবূ সুফইয়ানের কন্যা ৪৭৩
  - ২. হাতিব ৪৭৪
  - ৩. রক্তপাতহীনতা ৪৭৫
  - ৪. আজ কাবাকে আল্লাহ সম্মানিত করছেন: ৪৭৭
  - ৫. আব্বাস, থামুন! ৪৭৮
  - ৬. 'আমি তাঁর হাতও কাটতাম।' ৪৮০
  - ৭. এটি নুবুওয়াত! ৪৮০
  - ৮. বিজয়ের পর আর হিজরত নেই: ৪৮১
  - ৯. মক্কা বিজয়ের পর ইসলামের প্রসার ৪৮৩
  - ১০. উহুদের চেয়ে ভারী ৪৮৪
  - ১১. দ্বীনে কোনো জোরজবরদস্তি নেই ৪৮৬
  - ১২. আব্বাসের ইসলামগ্রহণ: ৪৮৯

হুনাইন যুদ্ধ ৪৯০
- নবি ﷺ-এর বিরুদ্ধে হাওয়াযিনের সৈন্য সমাবেশ ৪৯০
- মক্কা থেকে প্রস্থান ৪৯১
- যুদ্ধ শুরু হলো ৪৯১
- আবূ সুফইয়ান ও তার অনুরূপদের ভূমিকা ৪৯৩
- একের পর এক পরাজয় ৪৯৩
- গাযওয়াতুত তায়িফ ৪৯৪
- গনিমত বণ্টন ৪৯৫
- হুনাইন ও তায়িফের ভাবনা ৪৯৮
  - ১. কুরআনি শিক্ষা ৪৯৮
  - ২. ক্ষমাপ্রাপ্তরা ময়দানে ৫০০

৩. নবিজির বীরত্ব ৫০১
৪. যাদের মন জয় করা হয় ৫০৩
৫. সময় নিয়ে গনিমত বণ্টন ৫০৪
৬. বণ্টন কার্যক্রমের নিন্দা ৫০৬
৭. আনসারদের গনিমত ৫১০
৮. নেতৃত্ব ও কর্মীগণ : ৫১১
৯. আল্লাহর জন্য মুক্ত ৫১২
১০. মক্কায় নেতৃত্ব: ৫১৩
▪ বিজয়ের পরে ঘোষণা ৫১৪

গাযওয়ায়ে তাবূক ৫১৭
▪ বিশ্ববাসীর প্রতি ইসলামের দাওয়াত ৫১৭
▪ তাবূকের পথে ৫১৯
▪ তাবূকে ৫২১
▪ মদীনায় প্রত্যাবর্তন ৫২১
▪ পশ্চাতে যারা থেকে গেল ৫২৩
▪ গাযওয়ায়ে তাবূক : কিছু ভাবনা ৫৩০
১. বাধা অতিক্রম ৫৩০
২. নিফাক ৫৩২
৩. ইসলামি সমাজে ধনীদের অবস্থান : ৫৩৪
৪. ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ায় অংশীদারিত্ব : ৫৩৫
৫. ঈমানি সমাজে বস্তুবাদী ভাষার মর্ম ৫৩৮
৬. কাব ﷺ -এর হাদীস ৫৪০
৭. অবশেষে তাবূক যুদ্ধের ফসল ৫৪১
▪ তাবূক পরবর্তী কাল ৫৪৩
মাসজিদে যিরারের ঘটনা ৫৪৩
সাকীফের প্রতিনিধিদল ৫৪৬
তায়িফের ঘটনায় কয়েকটি বিষয় লক্ষণীয় ৫৪৮
মুনাফিকদের সর্দারের জীবনাবসান ৫৪৯
নবিজি ﷺ-এর স্ত্রীগণকে স্বাধীনতা প্রদান ৫৫২

আবূ বাকরের নেতৃত্বে হজ আদায় ৫৬৬

প্রতিনিধিদলগুলোর আগমন ৫৭০
▪ প্রতিনিধিদল আগমনের কিছু কারণ ৫৭০
১. মক্কা বিজয় ৫৭০

২. ইসলামের শক্তি ৫৭১
৩. সম্পর্কছিন্ন করা ৫৭১
৪. মূর্তি ভাঙচুর ৫৭২
▪ প্রতিনিধিদলের সাক্ষাত: কিছু নমুনা ৫৭৩
▪ আমির ও কর্মীদেরকে সাদাকাহর কাজে প্রেরণ ৫৭৫

দশম হিজরি: প্রতিনিধিদল প্রেরণ ৫৭৭
▪ বানু হারিস অভিমুখে খালিদ ইবনু ওয়ালীদের দল ৫৭৭
▪ ইয়ামানে মুয়াজকে প্রেরণ ৫৭৮
▪ আলি ও খালিদ ﷺ-কে ইয়ামানে প্রেরণ ৫৭৯
▪ দুই কাজ্জাব—মুসাইলামা ও আসওয়াদ ৫৮২

বিদায় হজ ৫৮৬
▪ উসামার বাহিনী ৫৯২

রাসূল ﷺ- এর অসুখ ও ওয়াফাত ৫৯৫
▪ নবি ﷺ-এর শেষ কথা ৬০৪

তথ্যসূত্র ৬০৮

লেখক পরিচিতি

শায়খ সালেহ আহমাদ শামী হাফিযাহুল্লাহ সিরিয়ার বিশিষ্ট সালাফি আলিম। সুন্নাহ ও সীরাত শাস্ত্রের নিভৃতচারী জ্ঞানসাধক। সমসাময়িক আলিমদের মাঝে তাঁর গ্রহণযোগ্যতা সুবিদিত।

১৯৩৪ খ্রিষ্টাব্দে তিনি দামেশকের উপকণ্ঠে দুমা শহরে জন্মগ্রহণ করেন। ঐতিহ্যবাহী দ্বীনি পরিবেশে ইলম ও আমলের তারবিয়াত লাভ করেন। তাঁর পিতা আহমাদ ইবনু সালেহ শামী ছিলেন হাম্বলি মাজহাবের বিশিষ্ট ফকিহ ও দুমার প্রধান মুফতি। তাঁর কাছেই তিনি লাভ করেন আত্মশুদ্ধি ও দ্বীনের পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা। দামেশকের বিখ্যাত ইলমি পরিবেশে তিনি বিশিষ্ট শায়খদের শিষ্যত্ব লাভে ধন্য হন। শায়খ আবদুর রাহমান তীবি, শায়খ আবদুল গানী দাকার, শায়খ আবদুল কারীম রিফায়ী ও শায়খ আবদুল ওয়াহহাব হাফিজ তাঁদের অন্যতম। তাঁরা ছিলেন তৎকালীন দামেশকের ইলমি আকাশের একেকটি উজ্জ্বল নক্ষত্র। এছাড়াও তিনি দামেশক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাকালীন ব্যাচের ছাত্র ছিলেন। ১৯৫৮ সালে দামেশক বিশ্ববিদ্যালয়ের শরিয়া অনুষদ থেকে গ্র্যাজুয়েশন সম্পন্ন করেন। ইলম, দাওয়াহ ও তারবিয়াতের ময়দানে নিজেকে উৎসর্গ করেন।

দামেশকে তাঁর কর্মজীবন শুরু হয় শিক্ষকতা ও জুমুআর খুতবা প্রদানের মধ্য দিয়ে। ১৯৮৪ সালে তিনি সপরিবারে সৌদি আরবে চলে যান। ১৯৯৮ সালে শিক্ষকতা থেকে অবসর গ্রহণ করেন। রিয়াদের একটি মসজিদে তিনি খতিব ছিলেন।

কালোত্তীর্ণ শতাধিক গ্রন্থের রচয়িতা তিনি। সময়ের প্রয়োজনে রচনা করেন অনন্য সব গ্রন্থ-সংকলন। ইসলামি নন্দনতত্ত্ব ও ইলমুল ফারায়িজে তিনি মৌলিক অবদান রাখেন। দক্ষতার স্বাক্ষর রাখেন বিভিন্ন আঙ্গিকে সুন্নাহর সংকলন ও পুনর্বিন্যাসে। তাঁর লেখালেখির সূচনা হয় সীরাতের মাধ্যমে। 'মিন মায়ীনিস সীরাহ' রচনার পর আরও চারটি বই নিয়ে সমাপ্ত হয় তাঁর রচিত এই সীরাত সিরিজ। সাম্প্রতিককালে 'মাআলিমুস সুন্নাতিন নাবাবিয়্যা' নামে নির্বাচিত হাদীসের একটি সংকলন প্রকাশিত হয় এবং বিশ্বজুড়ে ব্যাপক সমাদৃত হয়। সেখানে তিন খণ্ডে চমৎকারভাবে উঠে এসেছে হাদীসের ১৫টি মৌলিক গ্রন্থের সারনির্যাস।

বর্তমানে তিনি রিয়াদে বসবাস করছেন। বয়স নব্বই ছুঁই ছুঁই। এখনও তিনি নিরবচ্ছিন্ন শিক্ষাদান, সুন্নাহর চর্চা ও জ্ঞান-গবেষণায় নিমগ্ন। আল্লাহ তাআলা তাঁকে দীর্ঘ নেক হায়াত দান করুন এবং উম্মাহকে তাঁর ইলম থেকে যথাযথভাবে উপকৃত হওয়ার তাওফিক দান করুন। আ-মীন।

অনুবাদকের কথা

আলহামদুলিল্লাহ! মিন মায়ীনিস সীরাহ বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। অনুবাদ, সম্পাদনা ইত্যাকার সকল ধাপ একে একে পেরিয়ে প্রিয় সীরাতগ্রন্থ এখন আত্মপ্রকাশের দ্বারপ্রান্তে। সীরাতের ভালোবাসা ও লেখকের প্রতি মুগ্ধতার অকৃত্রিম অনুভূতি থেকেই এর অনুবাদে হাত দিয়েছিলাম। এই গ্রন্থের অসাধারণ দিকগুলো সচেতন পাঠকের মনোযোগ এড়াতে পারে না।

সমসাময়িক ও তথ্যপূর্ণ উপস্থাপনা, বিশুদ্ধ হাদীসের আলোকে সীরাতের বয়ান, স্থানে স্থানে আহরিত শিক্ষার মুক্তোঝরা আলাপ—এসব কিছু তো আছেই। মুতাওয়ারাস ফিকর অর্থাৎ প্রজন্মপরম্পরায় উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত চিন্তাধারা আমাদের শ্রেষ্ঠ সম্পদগুলোর অন্যতম। এই সীরাতগ্রন্থের অনন্য একটি বৈশিষ্ট্য হলো, এই জায়গায় মুহতারাম গ্রন্থকার বড় নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। আজকালকার কিছু সীরাতগ্রন্থে এই বিষয়টি এতটাই দুর্বল যে, পাঠকের হাতে দেখলে মনে শঙ্কা জাগে, যুগপ্রাসঙ্গিকতার স্রোতে ভেসে গিয়ে চিন্তাগত বক্রতার বালুচরে যেন আটকে না যায়।

গ্রন্থকার শাইখ সালেহ আহমদ শামী হাফি. আরববিশ্বের বিদগ্ধ আলিমেদ্বীন। সীরাত ও সুন্নাহর এই নিভৃতচারী জ্ঞানসাধক রচনার মৌলিকত্ব, চিন্তাগত ভারসাম্য, দ্বীনি আত্মমর্যাদাবোধ ও নবীপ্রেমে অনন্য। মাসলাক-মাশরাবের গণ্ডি পেরিয়ে তাঁর জনপ্রিয়তা তাই সর্বব্যাপী। দামেস্কের ঐতিহ্যবাহী ধর্মীয় পরিবেশে বেড়ে ওঠা গ্রন্থকারের প্রতি তাহকিকপ্রিয় আলিমদের বিশেষ অনুরাগ দেখার মত। মিন মায়ীনিস সীরাহ তাঁর সীরাত সিরিজের প্রথম বই। নবিজীবনের মৌলিক পাঠ ও শিক্ষা স্থান পেয়েছে এই বইটিতে। নির্ভরযোগ্য সূত্রের আলোকে রচিত বিশ্লেষণধর্মী এই রচনা পাঠককে মুগ্ধ করবে ইনশাআল্লাহ। ঐতিহ্য ও আধুনিক সময়ের মোহনায় এখানে গড়ে উঠেছে সীরাতের বিপুল বৈভব।

সীরাত মুমিনের জীবনের পাথেয়। সুন্নাহ এবং সীরাত মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ। সুন্নাহ যখন মুমিনের গাইডলাইন, সীরাত তারই কমেন্টারি। সাধারণভাবে মহানবীর জীবনের ধারাবাহিক ঘটনাবলিই সীরাতের আলোচ্য বিষয়। সীরাতের বাঁকে বাঁকে ছড়িয়ে থাকে অজস্র মর্ম ও শিক্ষা। সেসবের যথার্থ উপলব্ধি অনেক ক্ষেত্রেই জটিল ও কষ্টকর।

এর জন্য চাই ফিকরি সালামত ও ইলমি মাহারত। কারণ দ্বীনের প্রতিটি স্পর্শকাতর বিষয়ের সঙ্গেই সীরাতের রয়েছে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ যোগাযোগ।

বাংলা বইয়ের জগতে কমবেশি অনেক বই-ই এখন আছে, যেখানে নবিজীবনের গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাসমূহ আলোচিত হয়েছে। তবে এই বইটির বিশেষত্ব হলো, এখানে পাঠক এমন একজন লেখকের সাহচর্য পাবেন, যিনি ইলমুস সুন্নাহ ও ইলমুস সীরাতের বিশুদ্ধ চর্চায় নিজের জীবনকে উৎসর্গ করেছেন। বিদগ্ধ এই জ্ঞানসাধকের অপূর্ব লেখনিতে উদ্ভাসিত হয়েছে সীরাতের শাশ্বত আলোকধারা।

শ্রদ্ধেয় আহমাদ রোকনউদ্দীন ভাইসহ প্রকাশনার সঙ্গে জড়িত সকলের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। পাঠকের প্রতি বিনীত অনুরোধ—আমাদের ত্রুটিবিচ্যুতি সংশোধনে পরামর্শ ও মতামত দিয়ে বাধিত করবেন।

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সীরাত ও সুন্নাতের আলোকে জীবনগঠনের তাওফীক দান করুন। ইখলাস ও ইতকানের সঙ্গে দ্বীনের খিদমতে লেগে থাকার সুযোগ দিন। এই গ্রন্থকে নবীজি সা. -এর শাফাআত লাভের উসীলা হিসেবে কবুল করুন। আমীন।

সালমান আজিজ
চট্টগ্রাম
১১/১২/২০২২

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকা

সকল প্রশংসা বিশ্বজাহানের প্রতিপালক আল্লাহ তাআলার, পবিত্র ও বরকতপূর্ণ প্রশংসা তাঁরই জন্য নিবেদিত। সালাত ও সালাম পূর্ণ ও শ্রেষ্ঠভাবে নাযিল হোক শেষনবি ও শ্রেষ্ঠ রাসূল মুহাম্মাদ ﷺ-এর প্রতি। আল্লাহ তাঁকে প্রেরণ করেছেন বিশ্ববাসীর জন্য রাহমাতস্বরূপ। সালাত ও সালাম নাযিল হোক তাঁর পরিবার ও সকল অনুসারীর ওপর।

বইটির নামের ব্যাখ্যা হলো, মায়ীন অর্থ পানির ধারাস্রোত।
মায়ীনুস সীরাহ অর্থও তাই—পূতপবিত্র সীরাতের ধারাস্রোত।
এই সিরিজের বইগুলো সীরাতের পবিত্র ঝর্ণাধারারই অংশ যেন।

সিরিজের এটিই প্রথম বই। যেখানে নবিজি ﷺ-এর জিহাদ, জীবনের নানা ঘটনার বিবরণ ইত্যাদি বর্ণনা করা হয়েছে। এক্ষেত্রে সময়ক্রম রক্ষা করা হয়েছে।

এই সিরিজের দ্বিতীয় বই 'মিন মায়ীনিশ শামায়িল'। যেখানে নবিজি ﷺ-এর আচার-আচরণ ও আদব-আখলাকের আলোচনা করা হয়েছে।

সিরিজের তৃতীয় বই 'মিন মায়ীনিল খাসাইসিন নাবাবিয়্যা'। এখানে আলোকপাত করা হয়েছে আল্লাহ তাআলার নিকট রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মর্যাদা ও অবস্থান প্রসঙ্গে। আল্লাহ তাআলা যেসব বিষয়ে তাঁকে বিশেষত্ব দান করেছেন তার সূত্র ধরে।

পুনর্নিরীক্ষণ এবং কিছু টীকা ও ব্যাখ্যা সংযোজন ইত্যাদির পরে মিন মায়ীনিস সীরাহ-এর তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হচ্ছে। এই মুহূর্তে আল্লাহ তাআলার অশেষ প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা—তাঁর অনুগ্রহেই এই ধারাবাহিক কাজ সম্পাদিত হয়েছে। সকল নিয়ামাতের প্রশংসা ও শুকরিয়া একমাত্র তাঁরই। আমাদের সর্বশেষ প্রার্থনা হলো—'সমস্ত প্রশংসা বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য'।

সালেহ আহমাদ শামী
১ মুহাররাম ১৪২২ হি.
২৬ মার্চ ২০০১ ঈ.

যে যুগে রাসূল এলেন

খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতকের শেষ তৃতীয়াংশ। রাসূল ﷺ মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন। সে সময় মক্কা ছিল জাজিরাতুল আরবের হৃদপিণ্ডের মতো। মক্কাই ছিল সমগ্র আরবের ধর্মীয় কেন্দ্র। সেখানেই ছিল কাবা, যা নির্মিত হয়েছিল ইবরাহীম ও ইসমাইল ﷺ-এর হাতে। আরবরা পবিত্র কাবার দিকে হজের উদ্দেশ্যে আগমন করত। কাবাঘরের তাওয়াফ করত।

মহান কাবা নির্মিত হয়েছিল আল্লাহর ইবাদত ও তাওহীদের কেন্দ্র হওয়ার জন্য। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন:

وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَّطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَ
الْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ﴿٢٦﴾

‘আর স্মরণ করুন যখন আমরা ইবরাহীমের জন্য নির্ধারণ করে দিয়েছিলাম ঘরের স্থান, তখন বলেছিলাম, ‘আমার সাথে কোনো কিছু শরীক করবেন না এবং আমার ঘরকে তাওয়াফকারী, সালাতে দণ্ডায়মান ও রুকু-সিজদাকারীদের জন্য পবিত্র রাখুন।’[৫]

কিন্তু এরপর কাবার চতুর্দিক ভরে যায় নানান মূর্তি ও প্রতিমায়। আল্লাহকে ছেড়ে সেগুলোর উপাসনা করা হতো। অথবা আল্লাহর সঙ্গে সেগুলোকেও উপাস্য নির্ধারণ করা হয়েছিল।

মূর্তির উপস্থিতি কেবল মক্কাতেই সীমাবদ্ধ ছিল না। প্রত্যেক গোত্র নিজেদের জন্য একটি করে মূর্তি নির্ধারণ করে নিজ নিজ এলাকায় স্থাপন করেছিল এবং সেই মূর্তির উপাসনায় মনোনিবেশ করেছিল। ‘হুযাইল’ গোত্রের নির্ধারিত মূর্তির নাম ছিল ‘সুওয়া’। ‘রাহাত্ব’[৬] নামক এক স্থানে তারা সেটি স্থাপন করে। ‘কুলাইব’ গোত্রের মূর্তির নাম ছিল ‘উদ্দ’। ‘দুমাতুল জান্দালে’[৭] তা স্থাপন করা হয়। ‘ইয়াগুস’ ছিল

---

[৫] সূরা হজ, ২২ : ২৬।

[৬] রাহাত্ব: মক্কা থেকে উত্তর দিকে ৮৫ কি.মি. দূরে একটি উপত্যকা।

[৭] দুমাতুল জান্দাল: তাইমার উত্তরে প্রায় ৪৫০ কি.মি. দূরে অবস্থিত একটি গ্রাম।

'তাই' বংশের আনআম গোত্র ও মাজহাজ বংশের জুরাশবাসীদের উপাস্য। জুরাশ[৮] শহরে তারা এ মূর্তি স্থাপন করে। তেমনি হামাদান বংশের অন্তর্গত 'খাইওয়ান' গোত্র 'ইয়াউক'-কে তাদের উপাস্য বানিয়ে ইয়ামানের হামাদান অঞ্চলে স্থাপন করে। হিময়ার বংশের 'জুল-কালা' গোত্রের মূর্তি ছিল 'নাসর'। সেটি হিময়ারের ভূখন্ডে স্থাপিত হয়েছিল।[৯]

আরবরা কাবার পাশাপাশি কিছু তাগুতও বানিয়ে নিয়েছিল। সেগুলোর ছিল কিছু ঘর। তারা কাবার মতোই সেগুলোর সম্মান করত। সেবা ও রক্ষণাবেক্ষণ করত। কাবার মতোই সেগুলোর জন্য হাদিয়া দিত। কাবার মতোই তাওয়াফ করত। সেখানে পশু জবাই করত। তারা কাবাকে সেগুলোর চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করত। কারণ কাবা আল্লাহর খলিল ইবরাহিমের ঘর ও মাসজিদ।

কুরাইশ ও বনু কিনানার মূর্তি 'উযযা' ছিল নাখলা নামক স্থানে। বনু শাইবান উযযার দেখাশোনা ও তত্ত্বাবধান করত।

তায়িফে ছিল সাকিফ গোত্রের উপাস্য মূর্তি 'লাত'। সাকিফের অন্তর্গত বনু মুআত্তিব ছিল তার রক্ষণাবেক্ষণ ও তত্ত্বাবধানের দায়িত্বে।

আওস ও খাযরাজ গোত্রদ্বয়ের মূর্তি 'মানাত' ছিল মুশাল্লালের নিকটস্থ সমুদ্রের উপকূলে 'কুদাইদ' নামক স্থানে। 'তাবালাহ' নামক স্থানে ছিল দাওস, খাসআম ও বুজাইলা গোত্রগুলোর পবিত্রস্থান জুলখালাসা।[১০]

মূর্তিপূজার পবিত্রতা তাদের মনে এত ভীষণভাবে গেঁথে গিয়েছিল, তারা উপাসনার জন্য সফরের সময় সঙ্গে পাথর নিয়ে যেত। আবূ রাজা উতারিদি ﵀ বলেন, 'আমরা পাথরের পূজা করতাম। যদি সঙ্গে থাকা পাথরটির চেয়ে উত্তম কোনো পাথর পেতাম, আগেরটি ছুঁড়ে ফেলে নতুনটি তুলে নিতাম। যদি পাথর না পেতাম আমরা মাটি একত্র করে ঢিবি বানাতাম। তারপর ছাগল নিয়ে এসে তার ওপর দুধ দোহন করতাম এবং তাকে ঘিরে তাওয়াফ করতাম।[১১]

মূর্তির ছড়াছড়ি সত্ত্বেও মানুষ স্রষ্টা ও কারিগর হিসেবে মহান আল্লাহর অস্তিত্ব অস্বীকার করেনি। মানুষ এসব মূর্তির পূজাকে আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের উপায়ই নির্ধারণ করেছিল।

---

[৮] জুরাশ: সমৃদ্ধ নগরী। হিজরি চতুর্থ শতক পর্যন্ত শহরটি টিকে ছিল। নবিযুগে একে সামরিক দিক থেকে উন্নত শহরগুলোর অন্যতম মনে করা হতো। বর্ণিত আছে, তায়িফ অবরোধের সময় কিছু সাহাবি এখানে এসে ট্যাংক ও মিনজানিকের প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন। পরবর্তীতে শহরটি লুপ্ত হয়। বর্তমানে সৌদি শহর খামিস মুশাইতের নিকটে এর কিছু চিহ্ন বিদ্যমান রয়েছে।

[৯] সীরাত ইবনু হিশাম: ১/৭৮-৮০।

[১০] সীরাত ইবনু হিশাম: ১/৮৩-৮৬।

[১১] সহীহুল বুখারি: ৪৩৭৬।

وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖٓ اَوْلِيَآءَ ۘ مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُقَرِّبُوْنَآ اِلَى اللّٰهِ زُلْفٰى ؕ

‘যারা আল্লাহর পরিবর্তে অন্যকে অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করে তারা বলে, আমরা তো এদের পূজা এজন্যই করি যে এরা আমাদেরকে আল্লাহর নিকটে নিয়ে যাবে।’[১২]

এরূপেই ইবাদত, মান্নত, কুরবানি সব কিছুই তারা ভিন্ন মাবুদদের নামে করতে থাকে। ধীরে ধীরে ইবরাহীম ﷺ-এর ধর্মের সব চিহ্ন মুছে যায়। কেবল টিকে থাকে হজ। হজের রূপরেখাও বিকৃতির শিকার হয়। মানুষ নর-নারী নির্বিশেষে উলঙ্গ হয়ে তাওয়াফ করে। সালাত হয়ে পড়ে শিস ও হাততালিতে ভরপুর।

وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ اِلَّا مُكَآءً وَّتَصْدِيَةً ؕ

‘কাবাগৃহের নিকট শিস ও করতালি দেওয়াই কেবল তাদের সালাত।’[১৩]

তেমনি পবিত্র চার মাস নিয়ে তাদের যথেচ্ছাচারের ফলে ইবাদতের মৌসুমগুলোও কখনও সময়ের আগে চলে আসত, কখনও বিলম্বে।

তারা মৃত্যুর পর পুনরুত্থানকে অস্বীকার করত। আল্লাহ তাআলা বলেন:

وَقَالُوْا مَا هِيَ اِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوْتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَآ اِلَّا الدَّهْرُ ۚ

‘তারা বলে, একমাত্র পার্থিব জীবনই আমাদের জীবন। আমরা এখানেই মৃত্যুবরণ করি ও জীবিত থাকি। সময় আমাদেরকে ধ্বংস করে দেয়।’[১৪]

وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَّنَسِيَ خَلْقَهٗ ؕ قَالَ مَنْ يُّحْيِ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيْمٌ ﴿۷۸﴾

‘আর সে আমার সম্পর্কে উপমা পেশ করে, অথচ সে নিজের সৃষ্টির কথা ভুলে যায়। সে বলে, কে পঁচে-গলে যাওয়ার পর অস্থিতে প্রাণ সঞ্চার করবে?’[১৫]

এগুলোই তাদের আকীদার রূপ ও পথ।

তাদের সামাজিক জীবনের বুনিয়াদ ছিল গোত্রব্যবস্থা। এখানে গোত্রই ছিল সামাজিক একক। গোত্রপতি ছিলেন সকলের মান্যবর। গোত্রের সদস্যরা একে অপরকে সাহায্য করতে দ্বিধা করত না, যালিম হোক বা মাযলুম। সন্তান-সন্ততির আধিক্য কিংবা ধনাঢ্যতা, দাসদাসীর আধিক্য ও দানশীলতা গোত্রের ভেতর ব্যক্তির প্রভাব তৈরি করতে ভূমিকা রাখত।

---

[১২] সূরা যুমার, ৩৯ : ৩।
[১৩] সূরা আনফাল, ৮ : ৩৫।
[১৪] সূরা জাসিয়া, ৪৫ : ২৪।
[১৫] সূরা ইয়াসিন, ৩৬ : ৭৮।

সন্তান-সন্ততি বেশি থাকার গুরুত্ব বোঝা যায় আব্দুল মুত্তালিবের একটি ঘটনা দ্বারা। যখন তিনি যমযম খনন করতে যান, তাকে কুরাইশ বাধা দেয়। তখন তার কেবল একটিমাত্র সন্তান ছিল—হারিস। হারিস পিতার পক্ষে দাঁড়াতে পারেনি। আব্দুল মুত্তালিব অনুভব করেন যে পুত্র কম থাকায় তিনি দুর্বল। তাই মান্নত করেন, যদি তাঁর দশজন সন্তান হয়, তারপর তারা সাবালক হয়ে পিতাকে সুরক্ষা দিতে পারে, তবে কাবার নিকটে তিনি আল্লাহর জন্য তাদের একজনকে কুরবানি করবেন।[১৬]

তেমনিভাবে দাস-দাসী বেশি থাকাও গুরুত্বপূর্ণ ছিল। তারা মুনিবকে সাহায্য করত ও সুরক্ষা দিত। তাই আবূ বকর ﷺ যখন দাসীদেরকে আজাদ করা শুরু করেন, তার পিতা আবূ কুহাফা তাঁকে তিরস্কার করেছিলেন। আবূ কুহাফা বলেন, হে পুত্র, তুমি কেন দুর্বল দাসীদেরকে আজাদ করছো? যদি তুমি আজাদ করতে চাও, তবে শক্তিমান পুরুষ দাসদেরকে আজাদ করো। তারা তোমাকে রক্ষা করবে, তোমার পক্ষে দাঁড়াবে।[১৭]

আরব সমাজে নারীর বিশেষ কোনো মূল্য ছিল না। তাদের অধিকার ছিল না উত্তরাধিকার সম্পদে। পুরুষরা যতজন ইচ্ছা নারীকে বিয়ে করতে পারত। কিছু কিছু গোত্রে কন্যা সন্তানকে জীবিত মাটিচাপা দিয়ে হত্যার প্রথাও ছড়িয়ে পড়েছিল। তারা লজ্জার ভয়ে এমন করত। কখনও করত দারিদ্রতার কারণে।

অনেক প্রকারের বিয়ে প্রচলিত ছিল। আয়িশা ﷺ থেকে বর্ণিত আছে:

'জাহিলি যুগে চার প্রকার বিয়ে প্রচলিত ছিল। এক প্রকার ছিল বর্তমান সময়ের প্রচলিত বিয়ে। একজন পুরুষ অপর পুরুষের নিকট তার কন্যা বা তত্ত্বাবধানে থাকা নারীর জন্য প্রস্তাব দিত। তারপর মোহর আদায় করে তাকে বিয়ে করত।

আরেক প্রকার বিয়ে ছিল: কোনো মহিলা যখন ঋতুস্রাব থেকে পবিত্র হতো, তার স্বামী তাকে বলত, তুমি অমুক ব্যক্তির কাছে যাও, তার সঙ্গে যৌনমিলন করো। এরপর স্বামী সেই মহিলা থেকে পৃথক থাকত। যে পুরুষের সঙ্গে সঙ্গম করেছে, তার থেকে গর্ভবতী হওয়া পর্যন্ত স্বামী সেই মহিলাকে স্পর্শ করত না। গর্ভ প্রকাশ পাওয়ার পর ইচ্ছা করলে তার সঙ্গে মিলিত হতো। তারা এই কাজটি করত যেন সন্তান অভিজাত হয়। একে বলা হতো নিকাহুল ইস্তিবদা।

আরেক প্রকার বিয়ে ছিল: দশজনের কম একটি দল একত্রিত হয়ে কোনো মহিলার কাছে যেত। সবাই তার সঙ্গে সঙ্গম করত। যখন মহিলা গর্ভবতী হয়ে সন্তান প্রসব করত, প্রসবের কয়েক রাত অতিবাহিত হওয়ার পর সে তাদেরকে ডেকে পাঠাত।

---

[১৬] সীরাত ইবনু হিশাম, ১/১৫১।
[১৭] প্রাগুক্ত, ১/৩১৯।

সবাই আসতে বাধ্য হতো। সবাই তার কাছে একত্রিত হলে সে বলত, 'তোমরা সবাই তোমাদের কৃতকর্মের কথা জানো। আমার সন্তান হয়েছে। এটা তোমারই সন্তান হে অমুক।' যার নাম ইচ্ছা সে বলে দিত। এতে সন্তান তার হয়ে যেত। কেউ এতে বাধা দিতে পারত না।

চতুর্থ প্রকার: অনেক মানুষ একজন মহিলার কাছে যেত। মহিলাটি কাউকে ফিরিয়ে দিতে পারত না। তারা ছিল পতিতা। তারা নিজেদের ঘরের দরজায় পতাকা রাখত। যারই ইচ্ছা হয় তাদের কাছে অবাধে যেত। এরা গর্ভবতী হলে সন্তান প্রসবের পর সঙ্গমকারীরা সকলেই তার কাছে একত্রিত হতো। তারা কিয়াফা পারদর্শীদেরকে[১৮] ডাকত। তারা যাকে পিতা মনে করত, তার সন্তান হিসেবে ঘোষণা করত। সন্তানটি তার সঙ্গেই জুড়ে যেত, তার পুত্র হিসেবেই লোকমুখে প্রসিদ্ধ হতো। এটি মেনে নিতে সকলেই বাধ্য হতো।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে যখন সত্য দ্বীনসহ পাঠানো হলো, তিনি বর্তমানে প্রচলিত বিয়ে ছাড়া জাহিলি যুগের বিয়ের পদ্ধতিসমূহ বাতিল করেন।[১৯]

কখনও সম্পত্তির মতো নারীকেও উত্তরাধিকাররূপে গ্রহণ করা হতো। পিতার মৃত্যুর পর সৎমায়ের ক্ষেত্রে তাই হতো।

আনন্দময় বিলাসের জীবন আরবদের কদাচিৎ মিলত। মুগিরা ইবনু শুবা কাদিসিয়া যুদ্ধের পূর্বে ইয়াযদাজুর্দের সাথে সাক্ষাৎ করেন। তখন তিনি প্রাক-ইসলামি আরবদের দুরবস্থার কথা স্পষ্ট করে তুলে ধরেন। তিনি বলেন, "আর আপনি যে আমাদের দুরবস্থার কথা বললেন—কোনো কওম আমাদের মতো দুরবস্থার শিকার ছিল না। আমাদের ক্ষুধা ছিল চরম পর্যায়ে। আমরা কীটপতঙ্গ, গুবরেপোকা, বিচ্ছু, সাপ ইত্যাদি খেতাম। এগুলোকেই খাদ্য মনে করতাম। ভূপৃষ্ঠ ছিল আমাদের ঘরবাড়ি। উট ও ছাগলের পশম বুনে পোশাকের প্রয়োজন মেটাতাম। আমাদের ধর্ম ছিল একে অপরকে হত্যা করা, অথবা অন্যের ওপর যুলুম করা। খাবারে ভাগ বসানোর ভয়ে আমাদের কেউ কেউ তার কন্যাসন্তানকে জীবিত পুঁতে ফেলত।"[২০]

প্রত্যেক কবিলা স্ব স্ব ভূখণ্ডে স্বাধীন কর্তৃত্বের অধিকারী ছিল। কখনও এক কবিলা অন্য কবিলার ওপর চড়াও হতো। অন্যরাও তাদের ওপর আক্রমণ করত। তুচ্ছাতিতুচ্ছ কারণে গোত্রে গোত্রে যুদ্ধের আগুন জ্বলে উঠত। বনু আবস ও যুবইয়ানের মাঝে যেমন সংঘটিত হয় 'দাহিস ও গাবরা' যুদ্ধ।[২১]

[১৮] যারা সূক্ষ্ম বিভিন্ন আলামতের মাধ্যমে পিতার সঙ্গে পুত্রের সাদৃশ্য চিহ্নিত করতে পারে।
[১৯] সহীহ বুখারি: ৫১২৭।
[২০] আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া: ৭/৪২।
[২১] আবস ও যুবইয়ানে দুই গোত্রের দুটি ঘোড়ার মাঝে প্রতিযোগিতা হয়। একটির নাম ছিল 'দাহিস', আরেকটির নাম 'গাবরা'। প্রতিযোগিতার ফলাফলকে কেন্দ্র করে এই যুদ্ধের সূচনা হয়। -অনুবাদক।

একক কোনো রাষ্ট্র তাদের ছিল না। তবে মক্কার ছিল ধর্মীয় শ্রেষ্ঠত্ব। বাণিজ্যিক দিক থেকেও মক্কা ছিল কেন্দ্রীয় অবস্থানে। এখান থেকেই শীতকালে ইয়ামান ও গ্রীষ্মকালে শামের দিকে বাণিজ্যিক কাফেলা যাত্রা করত। এছাড়াও, হজের মৌসুমের পরে আরবের প্রসিদ্ধ বাজারগুলো বসত মক্কার অদূরেই।

দানশীলতা যদিও আরবদের মৌলিক একটি গুণ ছিল, তবু সুদের লেনদেন থেকে তারা বিরত থাকেনি। দুর্বলের ওপর সবলের শোষণের হাতিয়ার হিসেবে তা ব্যবহৃত হচ্ছিল। মদ-জুয়া ছিল তাদের সকাল-সন্ধ্যার প্রতিটি আসরের মূল আকর্ষণ।

এই ছিল আরব উপদ্বীপের আরবদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ। অন্যদিকে, উপদ্বীপের বাইরের সাধারণ রাজনৈতিক অবস্থা ছিল একটু ভিন্ন। প্রধান দুটি সাম্রাজ্য ছিল শাসকের আসনে। একটি হলো পৌত্তলিকতা ও নাস্তিকতার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত পারস্য সাম্রাজ্য। দ্বিতীয়টি খ্রিষ্টবাদে দীক্ষিত রোমান সাম্রাজ্য। বিকৃতির কারণে তারাও পৌত্তলিকতার কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিল। মানুষেরা ছিল নানা শ্রেণীতে বিভক্ত। শাসকশ্রেণীর তুলনায় সাধারণ জনগণের অবস্থান ছিল দাসের স্তরে।

ইহুদি ও নাসারা তথা আসমানি ধর্মসমূহ বিকৃতির শিকার হয়ে প্রকৃত রূপ হারিয়ে ফেলে। তাওহীদ অবলম্বন ও শিরক পরিত্যাগের আহ্বান ভুলে যায় তারা। তাদের শিক্ষাদীক্ষা ও প্রথা-পদ্ধতি পৌত্তলিকতার মতো হয়ে যায়। চিন্তাগত অবক্ষয়ের শিকার হয় তারা। ছড়িয়ে পড়ে কুসংস্কার ও অপসংস্কৃতি। ধোঁকা ও প্রতারণায় ভরে ওঠে তাদের ধর্ম। ধর্মীয় ব্যক্তিরা সাধারণ মানুষকে জিম্মি করে রাখে।

আরব সমাজে যত অনাচারই বিরাজমান থাকুক, চারিত্রিকভাবে অন্যদের চেয়ে তারা বেশ এগিয়ে ছিল। বদান্যতা, প্রতিবেশীর মর্যাদা, ইজ্জতের হেফাজত, বংশরক্ষায় গুরুত্বারোপ, ভদ্রতা, আত্মসম্মান, সাহসিকতা ইত্যাদি গুণ তাদের সমাজে প্রতিষ্ঠিত ছিল। এগুলো ছিল সম্ভ্রান্ত হওয়ার মাপকাঠি। এসব গুণের প্রমাণ দিতে না পারলে কেউ নেতৃত্ব লাভ করতে পারত না।

তেমনিভাবে তারা ছিল মানুষের সহজাত প্রকৃতিতে অভ্যস্ত। পার্শ্ববর্তী নগরজীবনের কৃত্রিমতা তাদের স্পর্শ করেনি। তাদের রক্তে ছিল স্বাধীনতা। তাই তারা অপমান ও লাঞ্ছনা সহ্য করতে পারত না। আত্মমর্যাদাবোধের শেকড় ছিল তাদের মনের গভীরে। আল্লাহ তাআলা এসব গুণের কয়েকটির কারণেই হয়তো শেষনবিকে তাদের মাঝে পাঠিয়েছেন। হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ সেদিকেই ইঙ্গিত করেছেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয় শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি সম্পর্কে। তিনি বলেন:

"তোমরা কি আরবের গোত্রসমূহের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করছো? জাহিলি যুগে যারা সর্বোত্তম ইসলামি যুগেও তারাই সর্বোত্তম, যদি তারা দ্বীনের জ্ঞান লাভ করে।"[২২]

[২২] সহীহ বুখারি: ৩৩৫৩, সহীহ মুসলিম: ২৩৭৮।

জন্ম থেকে নুবুওয়াতলাভ

মক্কার প্রধান আব্দুল মুত্তালিব একদিন ওয়াহাব ইবনু আব্দি মানাফ এর ঘরে গেলেন। বংশ ও আভিজাত্যে তিনি ছিলেন বনু যুহরা ইবনু কিলাবের প্রধান। আব্দুল মুত্তালিবের উদ্দেশ্য ছিল তার পুত্র আবদুল্লাহর সঙ্গে ওয়াহাবের কন্যা আমিনার বিয়ের প্রস্তাব দেওয়া। আমিনা ছিল বংশ ও মর্যাদায় কুরাইশের শ্রেষ্ঠ রমণী।

আকদ সম্পন্ন হয়। আমিনাকে নিয়ে আসা হয় স্বামীর ঘরে। কিন্তু আবদুল্লাহ কিছুদিন পরই ইন্তিকাল করেন। আমিনার গর্ভে তখন আবদুল্লাহর সন্তান। কিছুদিন পর সেই সন্তান ভূমিষ্ঠ হন। তিনিই ছিলেন মুহাম্মাদ ﷺ।

পবিত্র বংশ

রাসূল ﷺ-এর বাবার বংশ হলো: মুহাম্মাদ ইবনু আবদুল্লাহ ইবনু আব্দুল মুত্তালিব ইবনু হাশিম ইবনু আব্দি মানাফ ইবনু কুসাই ইবনু কিলাব... ইবনু মাআদ ইবনু আদনান।

মায়ের বংশ হলো: আমিনা বিনতু ওয়াহাব ইবনু আব্দি মানাফ ইবনু জুহরা ইবনু কিলাব ইবনু মুররা। মা-বাবার বংশ এভাবেই কিলাব ইবনু মুররা পর্যন্ত এসে মিলিত হয়েছে। তাই তিনি শ্রেষ্ঠ বংশের শ্রেষ্ঠ সন্তান। হয়তো এতেই নিহিত আছে আল্লাহ তাআলার অপার হিকমত। যাতে বংশের প্রশ্ন তুলে দ্বীনের দাওয়াতে বিঘ্ন ঘটানোর সুযোগ না থাকে। এজন্যই, যখন হিরাক্লিয়াস আবূ সুফইয়ানকে জিজ্ঞেস করেন, তোমাদের মধ্যে তার বংশ কেমন? তিনি উত্তর দেন, তিনি আমাদের মধ্যে সম্ভ্রান্ত বংশের।[২৩] আবূ সুফইয়ান তখন ছিলেন রাসূলের শত্রুপক্ষের নেতার ভূমিকায়।

এতেই হয়তো আল্লাহ তাআলার হিকমত নিহিত ছিল। যাতে সাম্য ও ন্যায়ের পথে রাসূলের আহ্বানের উৎস হয় সেই পথ ও পন্থা, যা নিয়ে তিনি আগমন করেছেন। যাতে তাঁর এই আহ্বান সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকে। মানসিক অবস্থা বা খারাপ সামাজিক বাস্তবতার প্রতিক্রিয়া যেন না হয়। মুহাম্মাদ ইবনু আবদুল্লাহ ﷺ

[২৩] সহীহ বুখারি, ৭। ইবনু ইসহাকের বর্ণনায় আছে, আবু সুফইয়ান বলেন, বংশকৌলিন্যে তিনি মধ্যম স্তরের।

যদি বংশমর্যাদায় এই শীর্ষস্থানে না হতেন, তাহলে নিশ্চিত বলা হতো—তিনি হারানো সামাজিক মর্যাদা ফিরে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষায় এই দাওয়াত দিচ্ছেন।

বাস্তবেই আমরা বস্তুবাদী মতবাদসমূহের প্রবক্তাদের অনেকের ক্ষেত্রে দেখি, তাদের মতবাদগুলো হয় যাপিত জীবনে তাদের অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষার প্রতিক্রিয়া। উদাহরণস্বরূপ আমরা মার্কসবাদ সম্পর্কে জানার জন্য কার্ল মার্কসের জীবনী পড়ে দেখতে পারি।[২৪] এজন্যই এসব মতবাদকে আন্দোলন বলা হয়, কারণ এগুলো প্রতিক্রিয়ার সমষ্টি।

জন্ম

রাসূলুল্লাহ ﷺ ৫৭০ খ্রিষ্টাব্দে রবিউল আওয়াল মাসের ১২ তারিখ সোমবার রাতে জন্মগ্রহণ করেন। এই বছরই আবরাহা হাতি-বাহিনী নিয়ে কাবা আক্রমণ করে। প্রসবের পর মা আমিনা দাদা আব্দুল মুত্তালিবের নিকট সংবাদ পাঠান, আপনার বংশে পুত্রসন্তানের জন্ম হয়েছে। আব্দুল মুত্তালিব খুশী হয়ে তাঁকে দেখতে আসেন। তাঁর নাম রাখেন মুহাম্মাদ।

দাদার জিম্মায়

যেহেতু প্রিয়নবি জন্ম থেকেই ইয়াতিম ছিলেন, লালনপালনের দায়িত্ব ছিল দাদার। আর দাদা তাঁকে নিয়ে অত্যন্ত স্নেহপরায়ণ ও গর্বিত ছিলেন। তাঁকে এত আদর করতেন যা নিজের সন্তানদেরও করতেন না। সবসময় কাছে কাছে রাখতেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ ব্যতীত কেউই আব্দুল মুত্তালিবের বিছানায় বসত না, এমনকি তাঁর সন্তানরাও না।

দুধপান

বনু সাদের মহিলারা মক্কায় আসা পর্যন্ত নবজাতক তার মায়ের কোলেই ছিল। তারা এসেছিল দুগ্ধপায়ী শিশুর খোঁজে। হালিমা বিনতু জুআইব সাদিয়া ﵂ বলেন, সব মহিলার নিকটই রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে গ্রহণ করার প্রস্তাব আসে, কিন্তু তিনি ইয়াতিম এটি জানার পর সবাই নিতে অস্বীকার করে। কারণ আমরা শিশুর পিতার কাছে কিছু সাহায্য পাব—এই আশা রাখতাম। আমরা তাঁকে দেখে বলতাম—সে ইয়াতিম? তাঁর মা আর দাদা আমাদের জন্য কীইবা করবে? আমরা এজন্যই তাকে গ্রহণ করতে

[২৪] কার্ল মার্কস ১৮১৮ খ্রি./১২৩৩ হি. এক ইহুদি পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। আর্থিক কারণে তার পিতা খ্রিষ্টান হয়ে যান। বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে তিনি তেমন প্রশংসিত ছিলেন না। অনুভূতির জগতেও ছিলেন ব্যর্থ। উচ্চ শ্রেণীর এক মেয়েকে তিনি ভালোবাসতেন, কিন্তু সামাজিকভাবে নিম্নস্তরের হওয়ায় মেয়ের পরিবার রাজি হয়নি। জার্মানির বোন শহরে একটি কবিতার মজলিসে একজন ধনী সদস্যের সাথে তার তরবারি-যুদ্ধ হয়। সেই ব্যক্তি জয়ী হয় এবং তার ভ্রুতে আঘাত করে। দরিদ্র পরিবার থেকে আসার কারণে তিনি ধনীদের প্রতি চরম ক্ষুব্ধ ছিলেন। শেক্সপিয়রের একটি কবিতা সর্বদা আবৃত্তি করতেন। "হে মূল্যবান চকচকে স্বর্ণ! সাদাকে তুমি কালো বানাও, অসুন্দরকে করো সুন্দর... কাপুরুষকে করো ভীরু!" এই সামাজিক বৈষম্যের শিকার হওয়ায় তার প্রচারিত মতবাদে মানুষে মানুষে হিংসার চর্চা করা হয়।

কুণ্ঠিত হই। আমার সঙ্গে আসা মহিলারা সকলেই একজন করে শিশু নিয়ে নেয়। কেবল আমি শূন্যহাতে থেকে যাই। যখন আমরা ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিই—আমি আমার স্বামীকে বললাম, আল্লাহর কসম, সফরসঙ্গী মহিলাদের সঙ্গে এসেও কোনো শিশুকে না নিয়ে ফিরে যেতে মন সায় দিচ্ছে না। আমি অবশ্যই সেই ইয়াতিমকে নিয়ে নেবো। তাঁর বাসায় গিয়ে আমি তাঁকে নিয়ে নিলাম। তাঁকে শুধু এজন্যই নিয়েছি যে, আর কোনো শিশুকে আমি নিতে পারিনি।[২৫]

তাঁর পবিত্র সঙ্গের বরকতে হালিমার সৌভাগ্যের দুয়ার খুলে যায়। কল্যাণময় হয়ে ওঠে তার সবকিছু। তিনি বরকতময় এত নিদর্শন দেখেন যে, তাঁকে নিজের কাছে নির্ধারিত সময়ের চেয়ে বেশি রাখতে আগ্রহী হয়ে ওঠেন।

হালিমার এই বর্ণনা থেকে স্পষ্ট হয় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্ম ও জন্মের পর মানুষের আচরণ ছিল স্বাভাবিক। আর দশজন শিশু থেকে তাঁকে আলাদা করা যায় তেমন বিশেষ কিছু সেখানে ছিল না। কারণ তখন কেউই বুঝতে পারেনি যে তিনিই আল্লাহর রাসূল ﷺ।[২৬]

মা ও দাদার ইন্তিকাল

দুধপানের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ মায়ের কাছে ছিলেন। দাদা তাঁর দায়িত্ব পালন করতেন। ছয় বছর বয়সে মা শিশুপুত্রকে নিয়ে ইয়াসরিবে বনূ আদি ইবনুন নাজ্জারে রাসূলের মামাদের[২৭] মহল্লায় সফরে যান। কিন্তু ফেরার পথে মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী আবওয়া[২৮] নামক স্থানে তিনি ইন্তিকাল করেন।

আব্দুল মুত্তালিব এরপর বেশিদিন জীবিত ছিলেন না। দুবছর পর যখন তিনি ইন্তিকাল করেন, তখন নবিজি ﷺ-এর বয়স আট বছর।

আবূ তালিবের দায়িত্বগ্রহণ

সম্ভবত আব্দুল মুত্তালিব যখন টের পান—তার আয়ূ ফুরিয়ে আসছে, পুত্র আবূ

---

[২৫] সীরাতে ইবনু হিশাম: ১/১৬৩।

[২৬] এর অর্থ এই নয় যে, তার আগমন নিকটবর্তী হওয়ার আলামতস্বরূপ কোনো সুসংবাদ বা অলৌকিক ঘটনা ঘটেনি। তবে আমাদের উদ্দেশ্য হলো, জন্মের সময় তিনি ভবিষ্যত নবি—এই তথ্যটি কারো জানা ছিল না।

[২৭] হাশিম ইবনু আব্দি মানাফ ইয়াসরিবে এসে সালমা বিনতে আমরকে বিয়ে করেন। সালমা ছিলেন নাজ্জার বংশীয়। তাদের ঘরে জন্ম হয় রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর দাদা শাইবার, পরবর্তীতে তিনি পরিচিত হন আব্দুল মুত্তালিব নামে। এ কারণে বনূ নাজ্জার হলো আব্দুল মুত্তালিবের মামার বংশ।

[২৮] হিজাজের তিহামা অঞ্চলের একটি উপত্যকা। ফার' ও কাহা নামক দুটি উপত্যকার সংযোগস্থল। এই দুই উপত্যকা মিলে এটি তৈরি হয় এবং একটি এলাকা অতিক্রম করে সমুদ্রে গিয়ে মেশে। (মু'জামুল মাআলিমিল জুগরাফিয়্যাহ)

তালিবকে[২৯] ভ্রাতুষ্পুত্র মুহাম্মাদের ব্যাপারে অসিয়ত করে যান। কারণ আব্দুল মুত্তালিবের দুই পুত্র আবূ তালিব ও আবদুল্লাহ একই মায়ের সন্তান। তাদের মা হলেন ফাতিমা বিনতু আমর আল-মাখযূমিয়্যাহ।[৩০] তাই চাচা আবূ তালিব দাদার মৃত্যুর পর থেকে রাসূল ﷺ-এর দেখাশোনা করতে থাকেন।

ছাগল চরানো

নবি ﷺ-এর বয়স হলে তিনি ছাগল চরাতে শুরু করেন। যাতে তাকে চাচার ওপর বোঝা হয়ে থাকতে না হয়। নবিদের জীবনচরিতে দেখা যায়, জীবনের কোনো এক সময়ে তাঁরা এই পেশা গ্রহণ করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

'আল্লাহর প্রেরিত প্রত্যেক নবিই ছাগল চরিয়েছেন।

সাহাবিগণ জিজ্ঞেস করলেন, আর আপনি? তিনি উত্তরে বললেন,

হাঁ, আমিও কয়েক কীরাতের[৩১] বিনিময়ে মক্কাবাসীর ছাগল চরাতাম।'[৩২]

অভিনব কিছু বৈশিষ্ট্য

মুহাম্মাদ ইবনু আব্দিল্লাহ আল্লাহর পরিচর্যায় বড় হতে লাগলেন। তিনি ছিলেন জাহিলিয়্যাহর সকল পঙ্কিলতা থেকে মুক্ত, যাবতীয় শ্রেষ্ঠ গুণে গুণান্বিত। মানবতা, উত্তম চরিত্র, ধৈর্য, সত্যবাদিতা এসবে যেমন গোত্রের সকলকে ছাড়িয়ে যান, তেমনি বংশমর্যাদায়ও তিনি ছিলেন শ্রেষ্ঠ। সকল গুণের চিহ্নস্বরূপ তাঁর উপাধি হয়—আল-আমিন তথা বিশ্বস্ত। সবাই কথায় কথায় বলতো—আল-আমীন আসল, আল-আমীন গেল ইত্যাদি।

পুরুষ হওয়ার আগেই তিনি পৌরুষের পরীক্ষায়ও উত্তীর্ণ হন। পনের বছর বয়স না হতেই তিনি ফিজার[৩৩] যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তিনি বলেন, আমি যুদ্ধ চলাকালে

---

[২৯] তার নাম ছিল আব্দু মানাফ।

[৩০] এছাড়া আব্দুল মুত্তালিবের পুত্রদের মধ্যে কেবল যুবাইর ছিলেন ফাতিমার সন্তান। আর সাফিয়্যা ছাড়া সকল কন্যা ছিলেন তার সন্তান।

[৩১] আলিমগণের মতে, এখানে কীরাত শব্দের দুটি অর্থ হতে পারে। ১. দিনার বা দিরহামের অংশ। ২. মক্কার একটি এলাকার নাম। (ফাতহুল বারী) শাইখ আবু জাহরাহ ﷺ খাতামুন নবিয়্যিন গ্রন্থে লিখেন, কীরাত হলো দুধের অংশ। অর্থাৎ নবি ﷺ এই শর্তে ছাগল চরাতেন যে, তিনি সেসব ছাগলের দুধের একটি অংশ পাবেন।

[৩২] বুখারী, আস-সহীহ, ২২৬২।

[৩৩] ফিজার অর্থ পরস্পরে পাপাচারে লিপ্ত হওয়া। এই নামের কারণ হলো—এটি হারাম মাসে সংঘটিত হয়। কুরাইশ, বনূ কিনানাহ ও বনূ গাইলানের কাইস গোত্রের মাঝে এই যুদ্ধ হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ কিছুদিন এতে অংশ নেন। চাচারা তাঁকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলেন। (ইবনু হিশাম, আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ, ১/১৮৪-১৮৬)

নিক্ষেপ করার জন্য চাচাদের হাতে শত্রুপক্ষের নিক্ষিপ্ত তির তুলে দিতাম।[৩৪]

মধ্যবয়স্কদের সাথেও অংশ নেন তাদের শ্রেষ্ঠ কীর্তিগুলো প্রতিষ্ঠায়। অথচ তাঁর বয়স তখনও বিশের ঘর অতিক্রম করেনি। হিলফুল ফুযুল অঙ্গীকার[৩৫] সম্পাদনে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম। সেখানে তারা অঙ্গীকারাবদ্ধ হন—মক্কার স্থানীয় বা মুসাফির যে-ই যুলুমের শিকার হবে, তারা তার সঙ্গ দেবেন। তারা যালিমের বিরুদ্ধে অবস্থান নেবেন—যতক্ষণ না যালিম মাযলুমের হক আদায় করে। পরবর্তীতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, 'আমি আবদুল্লাহ ইবনু জাদআনের ঘরে এক অঙ্গীকারে অংশ নিয়েছিলাম, যা আমার নিকট লাল উটের (অর্থাৎ উৎকৃষ্টতম সম্পদের) মালিক হওয়ার চেয়েও প্রিয়। ইসলাম আগমনের পরেও যদি আমাকে এর জন্য ডাকা হয়, আমি তাতে সাড়া দেবো।'[৩৬]

তিনি ছিলেন মূর্তিপূজা থেকে বহুদূরে। শৈশব থেকেই মূর্তির প্রতি ছিল প্রচণ্ড ঘৃণা। বাহীরা পাদ্রী লাত ও উযযার নামে শপথ করে তাঁকে কিছু জিজ্ঞেস করলে তিনি উত্তর দেন: 'লাত-উযযার নামে শপথ করে আমাকে কিছু জিজ্ঞেস করবেন না। আল্লাহর শপথ, কোনোকিছুই আমার নিকট এসবের চেয়ে ঘৃণিত নয়।'

এসব গুণ, এছাড়া অন্য আরো অনেক শ্রেষ্ঠ গুণাবলি রাসূল ﷺ-কে কুরাইশের সেরা যুবকে পরিণত করে। তাঁর দিকে ঘুরে যায় সকলের দৃষ্টি। তাঁর আচার-ব্যবহার সকলের আলোচনার বিষয়বস্তু হয়ে ওঠে।

খাদীজা ﵂- এর সঙ্গে বিবাহ

খাদীজা বিনতু খুয়াইলিদ ﵂ ছিলেন একজন সম্ভ্রান্ত ও ধনী ব্যবসায়ী। তিনি পুরুষদেরকে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে ব্যবসার দেখাশোনায় নিয়োগ দিতেন। তাদের সঙ্গে লাভ-ক্ষতির অংশীদারিত্বের চুক্তি করতেন। তিনি যখন মুহাম্মাদ ﷺ-এর উন্নত চরিত্র, সত্যবাদিতা, বিশ্বস্ততা ইত্যাদি গুণ সম্পর্কে জানতে পারলেন—তাঁর নিকট লোক পাঠালেন। নিজের সম্পদ নিয়ে সিরিয়ায় বাণিজ্যে যাওয়ার প্রস্তাব দিলেন।

---

[৩৪] ইবনু হিশাম, আস-সীরাতুন নাবাওয়িয়্যাহ, ১/১৮৬।

[৩৫] এই মৈত্রীচুক্তি সংঘটিত হওয়ার কারণ হলো, যুবাইদ এলাকার এক লোক মক্কায় পণ্য নিয়ে আসে। আস ইবনু ওয়াইল তার পণ্য ক্রয় করে। পরে সে আর মূল্য পরিশোধ না করে নানা বাহানা করতে থাকে। সেই লোক তার মিত্রদেরকে সাহায্যের জন্য ডাকলেও তারা সাহায্য করতে অস্বীকৃতি জানায়। তখন সে আবূ কুবাইস পাহাড়ে উঠে কুরাইশ গোত্রকে লজ্জা দিয়ে উচ্চস্বরে আবৃত্তি করতে থাকে। কুরাইশ তখন কাবাপ্রাঙ্গণেই ছিল। রাসূল ﷺ-এর চাচা যুবাইর ইবনু আব্দিল মুত্তালিব দাঁড়িয়ে বললেন, বিষয়টা এভাবে ছেড়ে দেওয়া যায় না। তখন হাশিম, যুহরাহ ও তাইম গোত্রের কিছু লোক আবদুল্লাহ ইবনু জাদআনের ঘরে একত্রিত হন। অন্যতম পবিত্র মাস যুল-কা'দায় তারা আল্লাহর নামে শপথ করেন—মাযলুমের হক আদায় না করা পর্যন্ত যালিমের বিরুদ্ধে তারা মাযলুমের পক্ষে ঐক্যবদ্ধ হবেন। তারপর তারা আস ইবনু ওয়াইল থেকে ওই লোকের হক আদায় করে নেন। (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ২/২৯১)

[৩৬] ইবনু হিশাম, আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ, ১/১৩৪।

তাঁকে অন্যদের চেয়ে বেশি বিনিময় দেওয়া হবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ রাজি হলেন। খাদীজার সম্পদ নিয়ে তিনি শামের উদ্দেশে বেরিয়ে গেলেন। তাঁর সঙ্গী হলো খাদীজার গোলাম মাইসারা।

দায়িত্ব পালন করে তিনি পণ্যসামগ্রী নিয়ে মক্কায় ফিরে এলেন। বিপুল লাভ হলো তাঁর।

মাইসারা এই সফরে রাসূল ﷺ-এর উত্তম লেনদেন, আমানতদারিতা ইত্যাদি প্রত্যক্ষ করেছে। সে ফিরে এসে খাদীজা ﵂-কে তাঁর ব্যাপারে বিস্তারিত জানাল। এতে খাদীজা ﵂ তাঁর সঙ্গে বিয়েতে আগ্রহী হয়ে উঠলেন। অথচ তিনিই ছিলেন পুরুষদের চোখে দুর্লভ। খাদীজা নিজেকে পেশ করলেন নবিজির কাছে। কোনো মাধ্যম থাকুক বা না থাকুক, বিয়ে ঠিক হয়ে গেল।

রাসূলুল্লাহ ﷺ চাচা হামযা ﵁-কে নিয়ে বের হলেন। (অন্য বর্ণনায় আছে, আবূ তালিবকে নিয়ে) খাদীজার চাচা আমর ইবনু আসাদের কাছে গিয়ে প্রস্তাব দিলেন। তাঁর মোহর আদায় করলেন বিশটি যুবতী উষ্ট্রী। তিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রথম বিবাহিতা স্ত্রী। তাঁর জীবদ্দশায় অন্য কাউকে তিনি বিয়ে করেননি।

তখন নবিজির বয়স ছিল পঁচিশ বছর। অথচ খাদিজা ﵂-এর বয়স ছিল চল্লিশ।[৩৭]

পিতার চেয়েও মহানুভব

যাইদ ইবনু হারিসা খাদিজা ﵂-এর গোলাম ছিল। বিয়ের পর খাদিজা ﵂ রাসূল ﷺ-কে উপহারস্বরূপ যাইদকে দান করেন। রাসূল ﷺ তাকে আজাদ করে দেন। কিন্তু যাইদ রাসূল ﷺ-এর কাছেই থেকে যায়। একদিন মুক্তিপণের বিনিময়ে যাইদকে মুক্ত করে নিয়ে যাওয়ার জন্য তার পিতা হারিসা ও চাচা আসেন। তারা নবিজিকে বলেন: 'হে গোত্রপতির সন্তান! আপনারা হারামের বাসিন্দা ও প্রতিবেশী, দুঃস্থকে সাহায্য করেন, বন্দীকে খাবার দেন। আমরা আপনার কাছে আমাদের সন্তানের বিষয়ে কথা বলতে এসেছি, সে আপনার গোলাম। অনুগ্রহপূর্বক তাকে মুক্তি দিন।' তিনি উত্তরে বলেন: এছাড়া আর কিছু? তারা বলেন: আর কী? তিনি বলেন, তাকে ডেকে আনুন এবং বেছে নেওয়ার স্বাধীনতা দিন। যদি সে আপনাদেরকে বেছে নেয় তবে সে আপনাদের। আর যদি আমাকে বেছে নেয়, তাহলে যে আমাকে বেছে নিয়েছে আমি তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে যেতে পারি না। তারা বলেন, আপনি আমাদের জন্য সিংহভাগ সম্ভাবনা ছেড়ে দিয়ে অনুগ্রহ করেছেন। তারপর তিনি যাইদকে ডেকে বলেন: তুমি

[৩৭] তিনি নবিজির পূর্বে আবু হালা ইবনু জুরারা তামিমিকে বিয়ে করেন। আবু হালা তার দাম্পত্য বন্ধনেই ইন্তিকাল করেন। আবু হালা থেকে খাদিজা ﵂-এর দুটি সন্তান হয়েছিল। হিন্দ ও হালা। উভয়েই সাহাবি ছিলেন।

কি এঁদেরকে চেনো? যাইদ বলে: হাঁ, আমার পিতা ও চাচা। রাসূল ﷺ বলেন: তুমি আমাকে চেনো, আমাদের সাহচর্য কেমন তাও দেখেছো, এখন তুমি আমাকে বেছে নেবে না তাঁদেরকে? যাইদ বলে, আমি আপনার ওপর কাউকে অগ্রাধিকার দেবো না। আপনি আমার পিতা ও চাচার মতো। তারা বললেন, কী হে যাইদ, স্বাধীনতা ছেড়ে গোলামিকেই বেছে নিচ্ছ? পিতা, চাচা ও ঘরের লোকদের ছেড়ে দিচ্ছ? যাইদ বলে, হাঁ! আমি এই লোকটির কাছে যা পেয়েছি তাতে কাউকে কখনও তার ওপর অগ্রাধিকার দিতে পারি না। রাসূল ﷺ এসব দেখে হিজরের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে ঘোষণা দেন: আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে যাইদ আমার পুত্র, সে আমার ওয়ারিশ এবং আমি তার ওয়ারিশ। এটা দেখে পিতা ও চাচার মন ভালো হয়ে যায়। তারা ফিরে যান। এরপর থেকে যাইদকে যাইদ ইবনু মুহাম্মাদ নামে ডাকা হতো। ইসলামের আগমনের পর একদিন নাযিল হয়:

ٱدْعُوهُمْ لِءَابَآئِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ ٱللَّهِ ۚ

‘তাদেরকে তাদের পিতাদের নামেই ডাকো, সেটাই আল্লাহর নিকট অধিক ন্যায়সঙ্গত।’[৩৮]

এরপর থেকে তাকে যাইদ ইবনু হারিসা[৩৯] বলা হয়।

হারিসা পুত্রের এমন পছন্দ আশা করেননি। বরং তিনি ভেবেছিলেন যেদিন সে পরিবার-পরিজনের কাছে ফিরে আসবে—সেই দিনটি তার জীবনে ঈদের মতোই আনন্দপূর্ণ হবে। সে তো তাদেরকে অনিচ্ছায় বাধ্য হয়ে ছেড়ে এসেছে। কিন্তু এমন আচরণ ও নবিজির এই ব্যবহার ছিল সকল কল্পনার ঊর্ধ্বে। আমরা এমন এক সময়ের কথা বলছি যখন মুহাম্মাদ ﷺ রাসূল হননি। যাইদের রাসূল ﷺ-কে বেছে নেওয়া এবং পরিবার ও নিজ এলাকায় ফিরে যাওয়ার চেয়ে রাসূলের কাছে থাকাকেই অগ্রাধিকার দেওয়া, তাও এমন এক সময়ে যখন কোনো ব্যক্তি নিজের গোত্র থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া ছিল তার ব্যক্তিসত্তা ধ্বংস হওয়ার নামান্তর। এমন বয়সে যখন মানুষ আত্মীয়দের আদরে প্রতিপালিত হতে চায়—এসব কিছুই সব মানুষের সঙ্গে আচরণের ক্ষেত্রে রাসূলের উন্নত চরিত্র ও অনুপম গুণাবলির সুস্পষ্ট প্রমাণ দেয়। হয়তো কাছাকাছি থাকার ফলে যাইদ এ গুণগুলো বেশি বুঝতে পেরেছিলেন, এগুলোর গুরুত্ব তার মনে বেশি গেঁথেছিল। তাই রাসূল ﷺ-এর কাছে থাকাকেই তিনি মনেপ্রাণে গ্রহণ করেন। তাঁর কাছেই পিতার আদর, মহানুভবতা, মমতা ইত্যাদি সকল চাওয়া পেয়ে

[৩৮] সূরা আহযাব, ৩৩ : ৫।

[৩৯] তিনি খাঁটি আরব বংশীয় ছিলেন। তার বংশপরিক্রমা কালব ইবনু ওয়াবরাহ পর্যন্ত পৌঁছায়। তার মা ছিলেন তাই গোত্রের নারী সু’দা বিনতু সালাবা। তিনি যাইদকে নিয়ে নিজ পরিবারে বেড়াতে যান। আকস্মিক বনু কাইস ইবনু জিসরের একদল অশ্বারোহী তাদের কাফেলায় হামলা করে। তারা যাইদকে মিসইয়াশা বাজারে বিক্রি করে দেয়। তিনি তখন আট বছরের বালক। (আর-রাউজুল উনুফ, ১/২৮৬)

যান। বরং আরো বেশি পান।

এই মূল্যায়নের বিপরীতে ইসলামের আগমনের পূর্বে রাসূল ﷺ-ও আরবদের রীতি অনুসারে তাকে পুত্র বানিয়ে নেওয়ার ঘোষণা দেন। যাইদকে পুত্র ঘোষণা করা ছিল এসকল আবেগেরই সম্মানপ্রদর্শন ও মূল্যায়ন। এক সময় ইসলামের আগমন হয়। এরপর থেকে যাইদকে তার আপন পিতার নামেই ডাকা হতে থাকে।

কাবা নির্মাণ

রাসূল ﷺ-এর বয়স যখন ৩৫ বছর তখন কুরাইশ কাবা পুনঃনির্মাণের জন্য একত্র হয়। কারণ কাবাঘর নড়বড়ে ও দুর্বল হয়ে পড়েছিল, বন্যারও ভয় ছিল। তারা এজন্য প্রস্তুতি নেয়। কুরাইশ কাবাকে নানান ভাগে ভাগ করে। প্রত্যেক ভাগ ছিল একেক দলের দায়িত্বে। এর মধ্যে বনু আব্দি মানাফ ও বনু যাহরার দায়িত্বে ছিল ফটকের অংশ।

কাবা নির্মাণ শেষ হয়, হাজরে আসওয়াদ স্থাপনের সময় আসে। মানুষ এ নিয়ে বিবাদে জড়িয়ে পড়ে। প্রত্যেক গোত্রই চাচ্ছিল, তারাই কালো পাথর উঠিয়ে নিয়ে জায়গামতো স্থাপন করবে। এক পর্যায়ে সকলেই পাল্টাপাল্টি শপথ করে বসে এবং যুদ্ধের প্রস্তুতি নেয়। বনু আব্দুদ দার রক্তভর্তি একটি পাত্র নিয়ে হাজির হয়, বনু আদি-সহ তারা রক্তে হাত ডুবিয়ে মৃত্যুর পণ করে। তাদেরকে 'রক্তসিক্ত' আখ্যা দেওয়া হয়। এই অবস্থায় কেটে যায় চার বা পাঁচ রাত।

তারপর তারা মসজিদে একত্র হয়ে পরামর্শ করে। ইনসাফসম্মতভাবে ভাগ করে নিতে উদ্যত হয়। গোত্রের সবচেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ নেতা আবু উমাইয়া ইবনুল মুগিরা[৪০] প্রস্তাব দিলেন, মসজিদে যে সর্বপ্রথম প্রবেশ করবে তার সিদ্ধান্তই হবে চূড়ান্ত! সকলেই এই প্রস্তাব মেনে নিলেন। সবার প্রথমে প্রবেশ করলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ। তাঁকে দেখে সবাই বলে উঠলেন: 'এ তো পরম বিশ্বস্ত আল-আমীন। আমরা তার বিষয়ে সন্তুষ্ট। এ তো মুহাম্মাদ।' তিনি তাদের কাছে এলে তাঁকে ব্যাপারটি জানানো হলো। রাসূল ﷺ বলেন: আমাকে একটি কাপড় এনে দিন। কাপড় এনে দেওয়া হলে তিনি সেই কাপড়ের ওপর হাজরে আসওয়াদ রাখলেন। এরপর বললেন, প্রত্যেক গোত্র কাপড়ের একটি করে প্রান্ত ধরুন। তারপর সবাই মিলে সেটি তুলে নিন। সবাই তাই করল। যথাস্থানে পৌঁছানোর পর নবি ﷺ তা নিজ হাতে উঠিয়ে রাখলেন। তার ওপর নিজেই বসিয়ে দিলেন।

এভাবেই সাদামাটাভাবে মিটে গেল এমন একটি সমস্যা—যার জন্য মানুষ রক্তে হাত ডুবিয়েছিল। এমনভাবে সমাধা হলো যে সকলেই তাতে খুশি। মানুষ কাজে নেমে

[৪০] তিনিই উম্মুল মুমিনীন উম্মু সালামা ﵂-এর পিতা।

পড়ল, অবশিষ্ট নির্মাণকাজ সমাপ্ত করতে ব্যস্ত হয়ে উঠল আবার।

বাহ্যিক দৃষ্টিতে মনে হতে পারে এই সমাধানটি খুব সহজ ছিল, যে কারো মনেই বুদ্ধিটি আসতে পারত।

কিন্তু যদি আমরা চিন্তা করে দেখি, কুরাইশের চিন্তাশীল ও বুদ্ধিজীবীরাও এই নির্মাণকাজে অংশ নিয়েছিল, তারা সকলেই এই জটিলতা তৈরিতে ভূমিকা গ্রহণ করেছিল—কারো মনে একবারো আসেনি যে এমন একটি সমাধান হতে পারে। বরং তারা তরবারিই কোষমুক্ত করেছিল। এতে আমরা বুঝতে পারি বুদ্ধির দীপ্তি, বিচক্ষণতা, প্রতিভা ইত্যাদি গুণাবলি ছিল নবিজির অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

হেরাগুহায় ইবাদতনিমগ্নতা

আয়িশা ﵂ বলেন: রাসূল ﷺ-এর নিকট ওহি আগমনের ধারা প্রথমে শুরু হয় ঘুমের মধ্যে সত্য স্বপ্নের মাধ্যমে। তিনি কোনো স্বপ্ন দেখলেই তা দিনের আলোর মতো সত্য হতো। তিনি হেরা পাহাড়ে গিয়ে কয়েক রাত নির্জনে ইবাদত করতেন। এ উদ্দেশ্যে আসবাবপত্র নিয়ে যেতেন। এরপর ফিরে আসতেন, খাদীজা ﵂ পুনরায় আসবাব প্রস্তুত করে দিতেন। একদিন ফেরেশতা আচমকা হাজির হলো।[৪১]

এই হাদীস থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, ফেরেশতা আগমনের পূর্বের সময়টির প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল দুটি। প্রথমটি হলো: স্বপ্নে যা দেখতেন—বাস্তবে তা সত্য হওয়া। দ্বিতীয়টি হলো: জনমানুষ থেকে দূরে হেরাগুহায় ইবাদতে লিপ্ত হওয়া। এ ব্যাপারটি তার কাছে প্রিয় হয়ে উঠে। যেমনটি ইবনু হিশামের রিওয়ায়াতে বর্ণিত হয়েছে: আল্লাহ তাআলা তার কাছে নির্জনতাকে প্রিয় করে দেন, তার কাছে নির্জনে থাকার চেয়ে প্রিয় কিছুই ছিল না।[৪২]

আমরা সেই সময়কার ইবাদতমগ্নতার ধরণ নিয়ে কথা বলতে চাই। হয়তো আমরা দূরের কিছু ভাববো না যদি বলি: তিনি চারপাশের পরিবেশ নিয়ে ভাবতেন। গণমানুষের বাস্তবতা ও বর্তমান গন্তব্য, মূর্তিপূজা, জুলুম, দলান্ধতা, আত্মীয়তা ছিন্ন করা এসব তাঁকে ভাবিয়ে তুলত। আমরা এগুলোর আভাস পাই খাদীজা ﵂-এর উক্তিতে। তিনি রাসূল ﷺ-এর সেসব কাজ বর্ণনা করছিলেন যেগুলো ছিল তৎকালীন দুনিয়াকে তিক্ততায় ভরা বাস্তবতা পরিবর্তনের কিছু প্রয়াস। তিনি বলেন:

‘আল্লাহর শপথ, তিনি আপনাকে কখনোই লাঞ্ছিত করবেন না। আপনি তো আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করেন, সত্য কথা বলেন, অনাথদের দায়িত্ব বহন করেন,

[৪১] বুখারি, আস-সহিহ, ৩; মুসলিম, আস-সহিহ, ১৬০

[৪২] ইবনু হিশাম, সিরাত, ১/২৩৪; বুখারির বর্ণনায় আছে: নির্জনতাকে তাঁর নিকট পছন্দনীয় করে দেওয়া হয়।

মেহমানদের মেহমানদারি করেন, সত্য পথে আগত বিপগ্রস্তদের সাহায্য করেন।[৪৩]

এ হচ্ছে সেই পথ ও কর্মপদ্ধতি নিয়ে চিন্তা—যার মাধ্যমে এসব বৈশিষ্ট্য মানুষের জীবনে ছড়িয়ে পড়বে।

তিনি কখনও কখনও ইবরাহীম ﷺ-এর অবশিষ্ট শরিয়ত নিয়ে চিন্তা করতেন। হজের আচারকার্যে এই দ্বীনটি ফুটে উঠত। এমনকি এসব পূণ্যকর্মেও পরিবর্তন ও বিকৃতির পরশ লেগেছিল, সেগুলোতে নানা অলীক ধারণার অনুপ্রবেশ ঘটেছিল। ধীরে ধীরে এমন হয় যে কেবলই মানুষ একে অপরের ওপর নিজেকে বড় দেখানোর জন্য এই দ্বীনকে ব্যবহার করা শুরু করে। আহমাস[৪৪] হওয়ার বিদআত ছিল এরই বাস্তব বহিঃপ্রকাশ। পবিত্র কাবাঘরের তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে কুরাইশ ভাবতে থাকে যে অন্য যারা হজ পালনের জন্য মক্কায় আগমন করে তাদের চেয়ে তারা স্বতন্ত্র।

কুরাইশের নিজস্ব হজ প্রণালি গড়ে উঠে। মীকাতের আওতাধীন এলাকা থেকে যারা মক্কায় এসেছে, হিল্ল[৪৫] থেকে নিয়ে আসা খাদ্য খেতে তাদেরকে বারণ করে দেওয়া হয়। কুরাইশ হিল্ল থেকে আগমনকারীদেরকে আহমাসদের কাপড় ব্যতীত ভিন্ন পোশাকে তাওয়াফ করতে বারণ করে দেয়। আহমাসদের কাপড় না পেলে বিবস্ত্র তাওয়াফ করতে হবে। যদি কেউ হিল্ল থেকে নিয়ে আসা কাপড়ে তাওয়াফ করে, তাওয়াফ শেষ হওয়ামাত্রই তাকে সেই কাপড় ছুঁড়ে ফেলতে হবে। পরবর্তীতে কখনোই তা ব্যবহার করতে পারবে না।

জুবাইর ইবনু মুতয়িম[৪৬] ﷺ বলেন: আমি রাসূল ﷺ-কে ওহি নাযিল হওয়ার পূর্বেই একটি উটের পিঠে আরাফায় সাধারণ মানুষের সঙ্গে নিজ কওমের লোকদেরকে নিয়ে অবস্থান করতে দেখেছি। সেখান থেকে অন্যদের সঙ্গেই তিনি বেরিয়ে মুযদালিফায় আসেন।

কিন্তু তাঁর কওম আরাফায় অবস্থান ও প্রত্যাবর্তন পরিত্যাগ করে। অথচ তারা স্বীকার করত যে, আরাফাও মাশায়ির বা হজের নির্ধারিত অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু তাদের যুক্তি ছিল, তারা হারামবাসী, তাই হারাম থেকে বের হওয়া তাদের উচিত হবে না।

এভাবেই রাসূল ﷺ আশেপাশের সবকিছু নিয়ে ভাবতেন। প্রতিটি বিষয়ই ছিল সংশোধন বা পরিবর্তনের মুখাপেক্ষী। তিনি ছিলেন হারামের আঙ্গিনা ভরিয়ে রাখা ও

[৪৩] হকের ওপর চলার কারণে যেসব বিপদের মুখোমুখি হতে হয়।

[৪৪] আহমাস অর্থ, যার ধর্মবোধ তীব্র ও শক্তিশালী। কুরাইশ নিজেদেরকে এই অভিধায় ভূষিত করে। এর ভিত্তিতে কিছু প্রথারও প্রচলন ঘটায়। একটি হলো, আরাফায় অবস্থান বর্জন করে মিনা থেকে হজ পালন করা।

[৪৫] যেসব অঞ্চল মীকাতের অভ্যন্তরে হলেও মক্কা বা হারামের বাইরে।

[৪৬] জুবাইর ইবনু মুতয়িম ইবনু আদি। সাহাবি। কুরাইশের আলিম ও গণ্যমান্যদের একজন। মদীনায় ইন্তিকাল করেন। (আল্লাহু আ'লাম)

আনাচে-কানাচে ছেয়ে থাকা মূর্তিদের থেকে দূরত্বে নির্জনবাসের মুখাপেক্ষী। তিনি ছিলেন সিংহভাগ মানুষের মনোজগত দখল করে থাকা পৌত্তলিকতা থেকে দূরত্ব বজায় রাখার মুখাপেক্ষী।

তিনি দেখতে পেতেন, সবকিছুই যেমন হওয়া উচিত আর যেভাবে চলে আসছে—দুইয়ের মাঝে তফাত বিশাল। সেই যুগে রাসূল ﷺ-এর বৈশিষ্ট্য ছিল: সুস্থ রুচি ও প্রকৃতি এবং সূক্ষ্ম অনুভব ও অনুভূতি।

পুরো চিত্র ছিল তার দৃষ্টি ও অন্তর্দৃষ্টির সামনে সম্পূর্ণ পরিষ্কার। কিন্তু কী করবেন তিনি? উত্তর এলো: আপনি পড়ুন।

নুবুওয়াতলাভ

ঐতিহাসিক ইবনু ইসহাক বলেন: যখন মুহাম্মাদ ﷺ-এর বয়স চল্লিশে উপনীত হয়, আল্লাহ তাআলা তাঁকে সমগ্র বিশ্বের জন্য ও পুরো মানবতার জন্য সুসংবাদদাতারূপে প্রেরণ করেন। রমাদানে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ওপর ওহি নাযিলের সূচনা হয়। আল্লাহ তাআলা বলেন:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْٓ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ ۚ

‘রমাদান মাস, এতে মানুষের দিশারী ও সৎপথের স্পষ্ট নিদর্শন এবং সত্যাসত্যের পার্থক্যকারীরূপে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে।’[৪৭]

ওহির সূচনা

সহিহ বুখারিতে উম্মুল মুমিনীন আয়িশা ﵂ থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন:

‘সত্য স্বপ্নের মাধ্যমে রাসূল ﷺ-এর নিকট ওহি আগমনের সূচনা হয়। তিনি কোনো স্বপ্ন দেখলেই তা প্রভাত ফোটার মতো বাস্তবায়িত হতো। এরপর নির্জনতাকে তাঁর নিকট প্রিয় করে দেওয়া হয়। তিনি হেরাগুহায় কয়েক রাত টানা একাকী ইবাদতে মগ্ন থাকতেন। এর আগে পরিবারের কাছে এসে কিছু খাদ্যসামগ্রী নিয়ে যেতেন। (ইবাদতে কয়েক দিন কাটিয়ে) তারপর ফিরে আসতেন খাদীজা ﵂-এর কাছে। পুনরায় অনুরূপ সময়ের জন্য আসবাবপত্র নিয়ে নিতেন। একদিন হেরাগুহায় অবস্থানকালে তার নিকট সত্যের আহ্বান এসে পৌঁছায়। ফেরেশতা এসে তাঁকে বললেন: আপনি পড়ুন। তিনি বললেন,

ما أنا بقارئ —আমি তো পড়তে পারি না।[৪৮]

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: তখন ফেরেশতা আমাকে জড়িয়ে ধরে প্রচণ্ড চাপ দিলেন। এতে আমার খুব কষ্ট হলো। তারপর ছেড়ে দিয়ে আবারও বললেন: **আপনি পড়ুন।** আমি উত্তর দিলাম, আমি পড়তে পারি না। দ্বিতীয়বার ফেরেশতা আমাকে জড়িয়ে

[৪৭] সূরা বাকারা, ২ : ১৮৫।
[৪৮] বুখারী, সহীহ, ৬৯৮২

ধরে সজোরে চাপ দিলেন। আমার খুব কষ্ট হলো। তারপর ছেড়ে দিয়ে বলল, **আপনি পড়ুন**। তারপর তৃতীয়বার আমাকে জড়িয়ে ধরে চাপ দিলেন। আমার খুব কষ্ট হলো। তারপর তিনি বললেন:

اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِیْ خَلَقَ ۚ خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۚ اِقْرَاْ وَ رَبُّكَ الْاَكْرَمُ ۙ

পাঠ করুন আপনার প্রতিপালকের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন মানুষকে রক্তপিণ্ড থেকে। পাঠ করুন, আর আপনার প্রতিপালক মহিমান্বিত।[৪৯]

রাসূলুল্লাহ ﷺ এই আয়াতগুলো নিয়ে ফিরে এলেন। তার কাঁধ থরথর করে কাঁপছিল। খাদীজার ঘরে প্রবেশ করে তিনি বলতে লাগলেন,

زملوني زملوني —"আমাকে ঢেকে দাও। আমাকে ঢেকে দাও।"

ঘরের লোকেরা তাঁকে ঢেকে দিল। এভাবে তাঁর সন্ত্রস্ততা দূর হয়ে গেল। তিনি খাদীজা ﵂-কে বিস্তারিত ঘটনা শুনিয়ে বললেন,

لقد خشيت على نفسي —"আমি জীবনের ভয়ে আছি।"[৫০]

খাদীজা ﵂ শুনে বললেন, 'কক্ষনো নয়। আল্লাহ আপনাকে কখনও লাঞ্ছিত করবেন না। আপনি তো আত্মীয়তার হক আদায় করেন, অসহায় দুঃস্থদের দায়িত্বগ্রহণ করেন, নিঃস্বকে সহযোগিতা করেন, অতিথির আপ্যায়ন করেন এবং সত্যের পথে বিপদগ্রস্তকে সাহায্য করেন।'

তারপর খাদীজা রাসূল ﷺ-কে নিয়ে ওয়ারাকা ইবনু নাওফাল ইবনু আসাদ ইবনু আব্দুল উযযার কাছে যান। তিনি ছিলেন খাদীজার চাচাতো ভাই। জাহিলি যুগে তিনি খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করেন। তিনি হিব্রু ভাষা জানতেন। আল্লাহর তাওফীক অনুযায়ী হিব্রু ভাষায় ইনজিল লিখতেন। তিনি অত্যন্ত বৃদ্ধ ও অন্ধ হয়ে যান। খাদীজা ﵂ তাঁকে গিয়ে বলেন, হে চাচাতো ভাই, আপনার ভাতিজা কী বলে শুনুন।

ওয়ারাকা তখন বললেন, বলো হে ভাতিজা, তুমি কী দেখো? আল্লাহর রাসূল ﷺ তখন যা দেখেছেন সব বললেন।

ওয়ারাকা বললেন, এ সেই বার্তাবাহক, যাকে আল্লাহ তাআলা হযরত মূসা ﵇-এর নিকট পাঠিয়েছিলেন। আফসোস, আমি যদি সেদিন যুবক থাকতাম! আফসোস, আমি যদি সেদিন জীবিত থাকতাম, যেদিন তোমার কওম তোমাকে বের করে দেবে!

---

[৪৯] সূরা আলাক, ৯৬:১-৩।
[৫০] বুখারী, সহীহ, ৬৯৮২

রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন,

أومخرجيهم؟ —"তারা আমাকে বের করে দেবে?"[৫১]

ওয়ারাকা বললেন, হাঁ, তোমার মতো আসমানি প্রত্যাদেশ যে-ই নিয়ে এসেছে তাঁর সঙ্গেই শত্রুতা করা হয়েছে। সেদিন যদি আমি বেঁচে থাকি, তোমাকে জোরালোভাবে সাহায্য করব।

এর কিছুদিন পরই ওয়ারাকা ইন্তিকাল করেন এবং ওহি আগমনে বিরতি ঘটে।"[৫২]

ইমাম বুখারি ﷺ জাবির ইবনু আব্দিল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি ফাতরাতুল ওহি বা ওহি আগমনে বিরতির কাল সম্পর্কে বলছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, 'আমি তখন হাঁটছিলাম। হঠাৎ আসমানে শব্দ শুনতে পেয়ে উপরে তাকিয়ে দেখি—হেরাগুহায় আগমনকারী ফেরেশতা। আসমান-জমিনের মাঝখানে একটি চেয়ারে তিনি বসে আছেন। আমি ভীত হয়ে ফিরে আসি। বলতে থাকি, আমাকে ঢেকে দাও। তখন আল্লাহ তাআলা নাযিল করেন,

يَاأَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ۝١ قُمْ فَأَنْذِرْ ۝٢ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ ۝٣ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ۝٤ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ ۝٥

হে বস্ত্রাচ্ছাদিত, উঠুন, আর সতর্ক করুন। আপনার প্রতিপালকের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করুন। আপনার পোশাক পবিত্র রাখুন আর পৌত্তলিকতা পরিহার করে চলুন।[৫৩]

এরপর আবার ওহি আগমন শুরু হয় এবং চলতে থাকে।[৫৪]

প্রথম বর্ণনাটি ছিল ওহি আগমন তথা নুবুওয়াতের সূচনা সম্পর্কিত। আর দ্বিতীয় বর্ণনাটি হলো নুবুওয়াতের স্তর শেষ হয়ে রিসালাতের স্তরে প্রবেশ সম্পর্কিত। ইবনুল কায়্যিম ﷺ বলেন, সর্বপ্রথম ওহি নাযিল হয়েছিল সূরা আলাকের প্রথম আয়াত। এটিই ছিল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নুবুওয়াত। তখন তাঁকে পড়ার নির্দেশ দেওয়া হয়, কিন্তু প্রচার করার নির্দেশ দেওয়া হয়নি। তারপর আল্লাহ তাআলা সূরা মুদ্দাসসির নাযিল করেন। অতএব, আলাকের এর মাধ্যমে নুবুওয়াত প্রদান করেন আর মুদ্দাসসিরের মাধ্যমে রিসালাত প্রদান করেন।

ফাতরাতুল ওহি বা ওহি আগমনে বিরতি

প্রথম রিওয়ায়াতের শেষে যে ফাতরাতুল ওহি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে,

[৫১] বুখারী, সহীহ, ৬৯৮২
[৫২] বুখারি: ৩; মুসলিম: ১৬০।
[৫৩] সূরা মুদ্দাসসির, ৭৪:১-৫।
[৫৪] বুখারি, ৪; মুসলিম, ১৬১।

তা ছিল রাসূল ﷺ-এর জীবনের কঠিন একটি সময়। তিনি নিজেকে নিয়ে এত দুঃখভারাক্রান্ত হয়ে ওঠেন যে, বারকয়েক উঁচু পাহাড় থেকে ঝাঁপ দেওয়ার উপক্রম হন। যখনই কোনো উঁচু পাহাড়ের প্রান্তে চলে যেতেন জিবরীল তাঁর কাছে উপস্থিত হয়ে বলতেন, 'হে মুহাম্মাদ, আপনি সত্যই আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত রাসূল।' তখন তাঁর উদ্বেগ কেটে যেত, তিনি শান্ত হতেন।[৫৫]

ফাতরাতুল ওহির সময়কাল ছিল তাঁর নবিজীবনের অন্তর্গত সময়। যাতে তিনি পরবর্তীতে রাসূল হওয়ার জন্য প্রস্তুত হন। এর সময়সীমা সম্পর্কে মতানৈক্য আছে। কেউ বলেন, তিন বছর। আর কেউ বলেন, তিন দিন। এ ব্যাপারে কেউ কোনো দলিল দেননি। প্রথম মতটি এজন্য ভুল হতে পারে যে, তিন বছর ছিল গোপনে দাওয়াত দেওয়ার সময়কাল—আর আল্লাহর রাসূল সরাসরি আল্লাহর নির্দেশ ছাড়া দাওয়াতের কাজ শুরু করে দেবেন, এটি কল্পনা করা যায় না। এছাড়াও লক্ষ্যণীয় ব্যাপার হলো, রিসালাতের একদম প্রথম দিক থেকেই নামাজের বিধান প্রবর্তিত হয়। তেমনি দ্বিতীয় মতটিও ভুল হতে পারে, কারণ পাহাড় থেকে ঝাঁপ দেওয়ার মতো উদ্বিগ্ন হওয়ার জন্য তিন দিন যথেষ্ট সময় নয়।

সম্ভবত ইবনু আব্বাস ﷺ-এর বর্ণনাই অধিক বিশুদ্ধ যে, ফাতরাতুল ওহির ব্যাপ্তি ছিল চল্লিশ দিন।[৫৬]

ফাতরাতুল ওহির তাৎপর্য

নিশ্চয়ই যে দায়িত্ব মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে প্রদান করা হয়েছিল, তা ছিল মানবসভ্যতার ইতিহাসে সবচেয়ে গুরুদায়িত্ব। এটি ছিল অত্যন্ত গুরুভার। এমনকি এই বাণীও ছিল অত্যন্ত ভারী। আল্লাহ তাআলা বলেন,

إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا ۝٥

"আমি আপনার প্রতি অবতীর্ণ করেছি গুরুভার বাণী।"[৫৭]

এজন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে মানসিকভাবে প্রস্তুত করার প্রয়োজন হয়। এর ভূমিকা ছিল সত্য স্বপ্নসমূহ। কাজি ইয়ায ও আরো অনেকে বলেন, স্বপ্ন দিয়ে শুরু হয় যাতে হঠাৎ ফেরেশতার আগমনে নবিজি ﷺ বিহ্বল না হয়ে যান। আচমকা যেন স্পষ্ট নুবুওয়াত চলে না আসে। মানবীয় শক্তি তা সহ্য করতে পারবে না। তাই প্রথমে নুবুওয়াতের

[৫৫] সহিহ বুখারিতে এই বর্ণনা সংযুক্ত সনদ ছাড়া উল্লিখিত হয়েছে। দেখুন, কিতাবুত তাবির, অধ্যায় ১, হাদীস ৬৯৮২। কেউ কেউ এই হাদীসটি অস্বীকার করেছেন, কারণ এটি আত্মহত্যার প্রচেষ্টা আর আত্মহত্যা করা হারাম। এই যুক্তির উত্তরে বলা যায়—তখনও আত্মহত্যা হারাম হওয়ার বিধান নাযিল হয়নি। মানুষ এমন কোনো বিষয়ে জবাবদিহিতার মুখোমুখি হয় না যে বিষয়ে হারাম হওয়ার বিধানই নাযিল হয়নি।

[৫৬] শারহুল মাওয়াহিবে (১/২৩৬) এই প্রসঙ্গে উল্লিখিত মতামতসমূহের বিস্তারিত পর্যালোচনা করা হয়েছে।

[৫৭] সূরা মুযযাম্মিল, ৭৩:৫।

একটি বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে শুরু হয়। মর্যাদাপূর্ণ নিদর্শনাবলি প্রকাশ পেতে থাকে।[৫৮]

তারপর ওহি আগমন শুরু হয়—ইকরা বা 'আপনি পড়ুন' এই নির্দেশের মাধ্যমে। বুখারির বর্ণনায় আমরা দেখেছি, রাসূলুল্লাহ ﷺ কী পরিমাণ কষ্ট আর যন্ত্রণা অনুভব করেছেন। তাই তাঁর একটু বিরতির প্রয়োজন ছিল, যেন তিনি ধ্বংস হয়ে যাওয়ার ভয় কাটিয়ে উঠতে পারেন। যেন ফেরেশতার চাপের ব্যথা দূর হয়ে যায়। একইসাথে যেন তাঁর মাঝে পুনর্মিলনের আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হয়।

এটিই ছিল আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রশিক্ষণ। যেন আসমানের সাথে সম্পর্কই হয় রাসূলের তত্ত্বাবধায়ক... এরপর ওহির আগমনধারা অব্যাহত থাকে।

আমি পড়তে পারি না

হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, জিবরীলের কথার উত্তরে রাসূলুল্লাহ ﷺ বারবার বলেছেন, আমি পড়তে পারি না। এটি স্পষ্ট একটি বাক্য, যার অর্থ হলো তিনি পড়তে জানেন না। কারণ ইতঃপূর্বে তিনি এ বিষয়ে শিক্ষালাভ করেননি। অধিকাংশ আরব তখন লেখাপড়া জানত না। নবি ﷺ-ও তাদেরই একজন ছিলেন। কুরআন মাজীদে এই দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন:

الَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الرَّسُوْلَ النَّبِيَّ الْاُمِّيَّ الَّذِيْ يَجِدُوْنَهٗ مَكْتُوْبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرٰىةِ وَ الْاِنْجِيْلِ

যারা অনুসরণ করে বার্তাবাহক উম্মি নবির, যার উল্লেখ আছে তাদের কাছে থাকা তাওরাত ও ইনজিলে, সেখানে তারা লিখিত পায়।[৫৯]

পবিত্র আয়াত থেকে স্পষ্ট যে, তাওরাত ও ইনজিলে তাঁর গুণাবলির মধ্যে এটিও বর্ণিত হয়েছে। এই গুণের উল্লেখ করা হয়েছে তাঁর জন্মেরও পূর্বে। অতএব, এটি আল্লাহ তাআলার বিশেষ হিকমাহ ও ইচ্ছার অন্তর্ভুক্ত। কুরআনে আল্লাহ তাআলা এই হিকমাহর দিকে ইঙ্গিত করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন:

وَمَا كُنْتَ تَتْلُوْا مِنْ قَبْلِهٖ مِنْ كِتٰبٍ وَّلَا تَخُطُّهٗ بِيَمِيْنِكَ اِذًا لَّارْتَابَ الْمُبْطِلُوْنَ

আপনি তো ইতঃপূর্বে কোনো কিতাব পাঠ করেননি এবং স্বহস্তে কোনো কিতাব লিখেননি যে, মিথ্যাচারীরা সন্দেহ পোষণ করবে।[৬০]

মরহুম মুহাম্মাদ রিযা সুন্দর ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বলেন, মুহাক্কিকগণ বলেন, উম্মি

[৫৮] শারহুয যুরকানি, ১/২১৮।
[৫৯] সূরা আরাফ, ৭ : ১৫৭।
[৬০] সূরা আনকাবুত, ২৯ : ৪৮।

হওয়া রাসূল ﷺ-এর মুজিযাসমূহের একটি। কারণ:

১. রাসূলুল্লাহ ﷺ বারবার কুরআনের বাক্যাবলি মুখস্থ বলতে থাকতেন। কোনো শব্দ বা বাক্যেও বিন্দুমাত্র পরিবর্তন আসত না। আরব বক্তা যখন উপস্থিত বক্তব্য দেয় তখন তার বক্তব্যে শব্দের কম-বেশি কিছু না কিছু হেরফের অবশ্যই হয়। অথচ রাসূল ﷺ পড়ালেখা না জানা সত্ত্বেও কোনোরূপ পরিবর্তন-পরিবর্ধন ছাড়া পাঠ করতেন। এটিও একটি মুজিযা। কুরআনে এদিকে ইশারা করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন:

سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰٓ ۝٦

নিশ্চয়ই আমি আপনাকে পাঠ করাব, ফলে আপনি ভুলে যাবেন না।[৬১]

২. যদি তিনি পড়ালেখা জানতেন তবে তাঁকে অপবাদের শিকার হতে হতো। বলা হতো, হয়তো তিনি পূর্ববর্তী নবিদের কিতাবসমূহ পাঠ করে এসব জ্ঞান লাভ করেছেন। যখন তিনি কোনো ধরনের শিক্ষালাভ বা অধ্যয়ন ছাড়াই এই বিপুল জ্ঞানের আধার কুরআন নিয়ে উপস্থিত হলেন—এটি মুজিযা হিসেবে গণ্য হলো। একারণেই আল্লাহ তাআলা বলেন:

وَمَا كُنْتَ تَتْلُوا مِنْ قَبْلِهِۦ مِنْ كِتٰبٍ وَّلَا تَخُطُّهُۥ بِيَمِينِكَ إِذًا لَّارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ

۝٤٨

আপনি তো ইতঃপূর্বে কোনো কিতাব পাঠ করেননি এবং স্বহস্তে কোনো কিতাব লিখেননি যে, মিথ্যাচারীরা সন্দেহ পোষণ করবে।[৬২]

---

[৬১] সূরা আ'লা, ৮৭ : ৬।

[৬২] সূরা আনকাবুত, ২৯ : ৪৮।

গোপনে দাওয়াত ও প্রথম মুসলিমগণ

গোপনে দাওয়াতের সূচনা

এই সময়টি হচ্ছে সূরা মুদ্দাসসির নাযিল হওয়ার পরবর্তী সময়কাল। এই অবস্থা অব্যাহত ছিল নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হওয়া পর্যন্ত:

فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ﴿٩٤﴾

অতএব, আপনি যে বিষয়ে আদিষ্ট হয়েছেন তা প্রকাশ্যে প্রচার করুন এবং মুশরিকদের উপেক্ষা করুন।[৬৩]

সীরাত গ্রন্থকারগণ প্রায় সকলেই একমত যে, এর সময়কাল ছিল তিন বছর।

এই সময়কালের ব্যাপারে সীরাত লেখকগণ খুব বেশিকিছু লিখেননি। তারা এটি আলাদা কোনো অধ্যায়ে বর্ণনাও করেননি। কেবল দাওয়াত সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে প্রাসঙ্গিকভাবে আলোচনা করেছেন।

উদাহরণস্বরূপ, ইবনু হিশাম ﵀ ইবনু ইসহাক থেকে বর্ণনা করেন: তারপর আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসূলকে নাযিলকৃত প্রত্যাদেশ প্রচার করার নির্দেশ দিলেন। আল্লাহর নির্দেশের দিকে আহ্বান জানানোর হুকুম দিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ কর্তৃক আল্লাহর পক্ষ থেকে আসা প্রত্যাদেশ গোপন রাখা ও প্রকাশ করার এই নির্দেশের মধ্যবর্তী সময় ছিল তিন বছর। আমি এমনই জানতে পেরেছি। নুবুওয়াতের পর থেকে তিনটি বছর এভাবেই (দাওয়াতবিহীন) কেটে গিয়েছিল।[৬৪]

সম্ভবত তিনি এই সময়ে ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিদেরই কেবল দাওয়াত দেন। নিকটাত্মীয়, যাদের মধ্যে তিনি কল্যাণ দেখতে পান, তাদের দাওয়াত গ্রহণ করার আশা করেন। এছাড়া যাদের ব্যাপারে তাঁর আস্থা ছিল—তারা দাওয়াত গ্রহণ না করলেও অন্তত ফাঁস করে দেবে না।

---

[৬৩] সূরা হিজর, ১৫ : ৯৪।

[৬৪] ইবনু হিশাম, আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ: ১/২৬২।

ভাবগাম্ভীর্যপূর্ণ ভঙ্গিমায় শান্ত ও দৃঢ়পদে সূচনা হলো দ্বীনের পথে দাওয়াতের। লক্ষ্যবস্তু ছিল বুদ্ধিমান ও চিন্তাশীল ব্যক্তিবর্গ। যাদের চেতনায় মূর্তিপূজা সর্বাংশে প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। তাঁরা সরাসরি পৌত্তলিকতার বিরোধিতা না করলেও অনেকের মতোই মূর্তি থেকে দূরে থাকত। বিশেষ করে তারা এমন কাউকে পায়নি যে তাদেরকে সত্যপথের সন্ধান দেবে। আমরা এ কারণে বলতে পারি, সেই সময়ের মুসলিমরা ছিলেন সুদৃঢ় ভিত্তির মতো, পরবর্তীতে যার ওপর ভিত্তি করে রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রতিষ্ঠা করেন ইসলামি দাওয়াতের সুউচ্চ ইমারত।

রাসূলুল্লাহ ﷺ গোপনে ইসলামপ্রচারে বেশ আগ্রহী ছিলেন। আলি ﷺ-এর ইসলাম গ্রহণের ঘটনা থেকে এটি স্পষ্ট বোঝা যায়।

একদিন আলি ﷺ রাসূলের ঘরে প্রবেশ করেন। ঘরে নবি ﷺ ও খাদীজা ﷺ একসঙ্গে নামাজ আদায় করছিলেন। তিনি বললেন, হে মুহাম্মাদ, এটি কী? তিনি বললেন,

'এটি আল্লাহর দ্বীন, যা আল্লাহ তাঁর নিজের জন্য নির্বাচন করেছেন। এই দ্বীন সহকারে রাসূল প্রেরণ করেছেন। আমি তোমাকে এক আল্লাহর দিকে ডাকছি যার কোনো শরীক নেই। আমি তোমাকে লাত-উযযাকে অস্বীকার করার আহ্বান করছি।'

আলি ﷺ বললেন, এই ধরনের দ্বীনের কথা আমি ইতঃপূর্বে শুনিনি। তাই আবু তালিবের সাথে কথা বলার আগে আমি কোনো সিদ্ধান্ত দিতে পারব না। রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজে প্রকাশ করার আগে এই গোপন দাওয়াত প্রকাশ পেয়ে যাওয়া অপছন্দ করলেন। তাঁকে বললেন, হে আলি, ইসলাম গ্রহণ না করলেও গোপনীয়তা রক্ষা করো। আলি ﷺ সেই রাত কাটিয়ে দিলেন। পরে আল্লাহ তাঁর অন্তরে ইসলামকে বিজয়ী করলেন।[৬৫]

আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবিগণ সেই সময়কালে এই ভঙ্গিতেই দাওয়াত দিতেন। কারণ তখন ঝগড়া-বিবাদ, তর্ক-ফ্যাসাদ এসব এড়িয়ে অন্তরে আকীদা দৃঢ় করাই ছিল সবচেয়ে জরুরি। এই সময়ে দাওয়াত সফল হওয়ার জন্য প্রয়োজন সচেতন হৃদয়, মর্মভেদী অন্তর ও আমানত রক্ষার বিপুল শক্তি। এজন্যই গোপনীয়তা রক্ষা করা অপরিহার্য ছিল।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে সাহাবিদের দেখা হতো নির্দিষ্ট কিছু গোপন স্থানে। একটি হলো আরকাম ইবনু আবিল আরকামের ঘর। সেখানে তারা কুরআনের আয়াতসমূহ শিক্ষাগ্রহণ করতেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে মিলিত হতেন।[৬৬]

---

[৬৫] ইবনু কাসীর, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া ওয়ান-নিহায়া, ৩/২৪।

[৬৬] উদাহরণস্বরূপ আবু যর ﷺ-এর ইসলামগ্রহণের ঘটনা পড়ে দেখুন। (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া: ৩/৩৪) আলি ﷺ তাকে সতর্কতার সাথে রাসূল ﷺ-এর ঘরের দিকে নিয়ে যাওয়ার সময় বলেন, আমাকে অনুসরণ করুন। আপনার ক্ষতির আশঙ্কা আছে এমন কিছু দেখলে আমি দাঁড়িয়ে পানি ঢালতে শুরু করব।

মুসলিমদের কেউ নামাজ আদায় করতে চাইলে কোনো গিরিপথে চলে যেত, যাতে মুশরিকরা তাঁকে না দেখে।

অগ্রগামী মুসলিমগণ

আশেপাশের লোকেরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ-এর ডাকে সাড়া দিয়ে মুসলিম হয়ে গেল।

রাসূলের স্ত্রী খাদীজা বিনতু খুওয়াইলিদ ঈমান আনলেন।

রাসূলের বন্ধু আবু বকর আবদুল্লাহ ইবনু আবী কুহাফা ঈমান আনলেন।

রাসূলের চাচাতো ভাই আলি ইবনু আবী তালিব ঈমান আনলেন। তাঁর বয়স তখন দশ বছর মাত্র। রাসূলের তত্ত্বাবধানেই তিনি পালিত হতেন।

রাসূলের আজাদকৃত গোলাম যাইদ ইবনু হারিসা ঈমান আনলেন।

আবু বকর নিজ গোত্রে সবার প্রিয়পাত্র ছিলেন। কুরাইশের বংশপরিক্রমা বিষয়ে পারদর্শী ছিলেন। ব্যবসায় ছিল তাঁর পেশা। তিনি ছিলেন সৎকর্মশীল ও চরিত্রবান। গোত্রের সকলের মধ্যমণি হয়ে ওঠেন তিনি। জ্ঞান, বাণিজ্য ও উত্তম সাহচর্যের কারণে সকলে তাঁর সঙ্গে ওঠাবসা করত। তিনি এই সুযোগে কওমের সেসব লোককে ইসলামের দাওয়াত দেন যাদের প্রতি তিনি সবিশেষ আস্থা রাখতেন। তাঁর দাওয়াতে যারা ইসলাম গ্রহণ করেন তারা হলেন:

» উসমান ইবনু আফফান উমাবি;

» যুবাইর ইবনুল আওয়াম আসাদি;

» আব্দুর রাহমান ইবনু আওফ যুহরি;

» সাদ ইবনু আবি ওয়াক্কাস যুহরি;

» তালহা ইবনু উবাইদিল্লাহ তাইমি।

ইসলামগ্রহণে সম্মত হলে তাঁদেরকে তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট নিয়ে আসতেন। তাঁরা ইসলাম গ্রহণ করে নামাজ আদায় করতেন।

এরপর আবু উবাইদা আমির ইবনু আব্দিল্লাহ ইবনুল জাররাহ ফিহরি, আবু সালামা আবদুল্লাহ ইবনু আব্দিল আসাদ মাখযূমি, উসমান ইবনু মাযউন জুমাহি, তার দুই ভাই—কুদামা ও আবদুল্লাহ, উবাইদা ইবনুল হারিস ইবনু আব্দিল মুত্তালিব, সাঈদ ইবনু যাইদ আদাবি, তার স্ত্রী ও চাচাতো বোন উমারের বোন ফাতিমা বিনতুল খাত্তাব প্রমুখ ইসলাম গ্রহণ করেন।

অন্যথায় আপনি আমার পিছু পিছু আসতে থাকবেন। - বুখারি: ৩৮৬১।

এরপর ইসলাম গ্রহণ করেন আসমা বিনতু আবী বকর, বনূ তামীমের খাব্বাব ইবনুল আরাত, সাদের ভাই উমাইর ইবনু আবী ওয়াক্কাস, আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ হুযালি, মাসউদ ইবনুল কারি, সুলাইত ইবনু আমর ফিহরি, আইয়াশ ইবনু রাবীআ মাখযুমি, তাঁর স্ত্রী আসমা বিনতু সালামা তামীমিয়্যা, খুনাইস ইবনু হুযাফা সাহমি, আমির ইবনু রাবীআ, আবদুল্লাহ ইবনু জাহাশ, তাঁর ভাই আবু আহমাদ;

জাফার ইবনু আবী তালিব, তার স্ত্রী আসমা বিনতু উমাইস;

হাতিব ইবনুল হারিস, তার স্ত্রী ফাতিমা বিনতু মুজাল্লাল ফিহরিয়্যা, ভাই হুতাব ইবনুল হারিস ও তার স্ত্রী ফুকাইহা বিনতু ইয়াসার;

মামার ইবনুল হারিস ও সায়িব ইবনু উসমান;

মুত্তালিব ইবনু আযহার ও তার স্ত্রী রামলাহ বিনতু আবি আউফ;

নুআইম ইবনু আব্দিল্লাহ নাহহাম;

আবু বকর ﷺ-এর আজাদকৃত গোলাম আমির ইবনু ফুহাইরা;

খালিদ ইবনু সায়িদ ইবনুল আস ও তার স্ত্রী উমাইনা বিনতু খালাফ খুজাইয়্যা;

হাতিব ইবনু আমর ফিহরি, আবু হুযাইফা ইবনু উতবা ইবনু রাবীআ ও ওয়াকিদ ইবনু আব্দিল্লাহ;

খালিদ, আমির, আকিল, ইয়াস ও বনূ বুকাইর;

আম্মার ইবনু ইয়াসির ও সুহাইব ইবনু সিনান ইত্যাদি।

ইবনু হিশাম ﷺ তার সীরাতগ্রন্থে এঁদের নাম উল্লেখ করেছেন।[৬৭]

ইবনু কাসীর ﷺ এদের নাম উল্লেখ করে সহিহ মুসলিম থেকে তার সাথে যুক্ত করেছেন—আমর ইবনু আবাসা[৬৮] ও বিলাল ﷺ-কে।[৬৯] তেমনিভাবে প্রথম ইসলাম প্রকাশকারীদের মধ্যে মিকদাদ ও আম্মারের মা সুমাইয়ার নাম উল্লেখ করা হয়েছে।[৭০]

আবু বকর ﷺ আমির ইবনু ফুহাইরা ছাড়াও আরো বেশ কয়েকজন গোলামকে আজাদ করেন। যেমন বিলাল, উম্মু উবাইস, যিন্নীরা, নাহাদিয়্যা ও তাঁর কন্যা।[৭১]

---

[৬৭] সীরাতু ইবনি হিশাম: ১/২৪৯-২৬১।
[৬৮] সহিহ মুসলিম: ৮৩২।
[৬৯] আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া ওয়ান-নিহায়া: ৩/৩১।
[৭০] প্রাগুক্ত: ৩/২৮।
[৭১] সীরাতু ইবনি হিশাম

আবু যর গিফারি ﷺ-কে প্রথমে ইসলাম গ্রহণকারীদের মধ্যে গণ্য করা হয়।[৭২]

এঁদের আগে ইসলাম গ্রহণ করেন সাইদ ইবনুল আস উমাবি। তিনি অগ্রগামীদের একজন। আল-ইসাবাহ গ্রন্থে ইবনু হাজার ﷺ বলেন, তিনি চতুর্থ বা পঞ্চম ব্যক্তি ছিলেন।

এরপর একে একে নারী-পুরুষ ইসলাম গ্রহণ করতে থাকে। একসময় ইসলামের আলোচনা মক্কায় ছড়িয়ে পড়ে। ইসলাম মানুষের আলোচনার বিষয়বস্তু হয়ে ওঠে।

উল্লিখিত নামগুলো লক্ষ্য করলে দেখা যায়, প্রথমে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছেন তাঁরা ছিলেন স্ব স্ব গোত্রের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। তাঁরা মোটেই ফেলনা ছিলেন না। তারা ক্রীতদাস ছিলেন না যে, নিজেদের স্বাধীনতা ফিরিয়ে আনার উদ্দেশ্যে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। অথচ ইসলামের শত্রুরা তাঁদের এভাবেই চিত্রায়ণ করে।

নিশ্চয়ই এই দ্বীন আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্দাদের প্রতি পথনির্দেশ। ইসলামের শিক্ষা ও নির্দেশাবলি বাস্তবসম্মত, কোনো প্রতিক্রিয়ার ফলাফল নয়।

একটি গুরুতর ভুল

সীরাত লেখকদের কেউ কেউ এখানে এসে পদস্খলনের শিকার হয়েছেন। প্রথমদিকে ইসলাম-গ্রহণকারীদের আলোচনা করতে গিয়ে কেউ কেউ লিখেছেন:

» আমরা সীরাত অধ্যয়ন করে জানতে পারি, এই সময়ে যারা ইসলাম-গ্রহণ করেছেন তাঁদের অধিকাংশই ছিলেন দরিদ্র, অসহায় ও ক্রীতদাস শ্রেণীর। এর তাৎপর্য কী?[৭৩]

» তিন বছর পর্যন্ত দাওয়াত অব্যাহত থাকার ফলাফল ছিল চল্লিশজন নারী-পুরুষের ইসলাম-গ্রহণ, যাদের প্রায় সবাই ছিলেন দরিদ্র, দুর্বল, মুক্তদাস ও ক্রীতদাস প্রকৃতির। আর তাদের শীর্ষে ছিলেন কয়েকজন অনারব। যেমন, সুহাইব রূমি ও বিলাল হাবশি।[৭৪]

» দুর্বল নারী-পুরুষ ও মুক্তদাস শ্রেণীর কিছু লোক তার প্রতি ঈমান আনে![৭৫]

কোনো সন্দেহ নেই যে তাঁরা অসদুদ্দেশ্যে এসব লিখেননি। বরং তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল, ইসলামকে মহান করে তুলে ধরা—ইসলাম তাঁদের মাধ্যমে প্রসারিত হয়েছে। অথবা এটি তুলে ধরা যে, ইসলামে স্বজনপ্রীতি ও জাতীয়তাবাদ নেই।[৭৬]

---

[৭২] বুখারি (৩৮৬১) ও মুসলিমের (২৪৭৪) হাদিসে এটি বর্ণিত হয়েছে।

[৭৩] ফিকহুস সীরাহ, সায়ীদ রামাদান বুতি, ৭৭।

[৭৪] প্রাগুক্ত: ৭৯।

[৭৫] হাদাইকুল আনওয়ার ওয়া মাতালিউল আসরার, ইবনুদ দাইবাগ : ১/৩০১।

[৭৬] এটি অবশ্যই ইসলামের ওপর অপবাদ। কিন্তু তার উত্তর দিতে গিয়ে তো স্বীকৃত বাস্তবতাকে পরিবর্তন